অস্তিত্ববাদ
শরীফ হারুন

অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন : ১৯৮৬
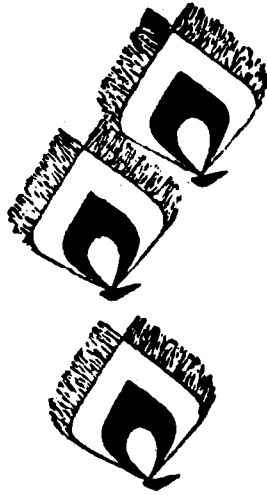
বাংলা একাডেমী ঢাকা

বা/এ ২৯৪৮

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৫। দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৯। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ। প্রকাশক : গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০০/জানুয়ারি ১৯৯৪। প্রকাশক : মুহাম্মদ নূরুল হুদা, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রণ : মেমোরিয়াল অফসেট প্রিন্টার্স, ৬৭/৬৮ যোগীনগর রোড, ওয়ারী, ঢাকা, বাংলাদেশ। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ । মূল্য : ৪০.০০ টাকা

BHASHA-SHAHEED GRANTHAMALA : Series in honour of the martyrs of the Language Movement of February, 1952.

OSTITWABAD [Existentialism] by Sharif Harun. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition December 1985. Second edition, December 1989. First reprint : January 1994. Price : Tk. 40 only.

ISBN 984-07-2957-8

উৎসর্গ

মায়ের স্মৃতির প্রতি

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণের কাজটি ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিভাগ থেকে করা হতো। এর কোন প্রয়োজন বা চাহিদাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না।

বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ সরাসরি বইপত্র বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একাডেমী প্রকাশিত কোন্ বই বেশি পাঠকনন্দিত, কোন্ বই ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত সে সম্পর্কে সমধিক ওয়াকিফহাল থাকায়, পুনর্মুদ্রণ কর্মটি বিওবি উপবিভাগের দায়িত্বে সম্পাদিত হলে কাজের সমন্বয় সাধন, প্রকাশনার দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ, ক্রেতা সাধারণের চাহিদা মোতাবেক দ্রুত বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাকার বিষয় ত্বরান্বিত হবে বিবেচনা করে কার্যনির্বাহী পরিষদ বিওবি'র আওতায় 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প' নামে একটি 'কোষ' গঠন করে।

নবগঠিত পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প বিগত অর্থ বছরে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থ ব্যতীতও পাঠকনন্দিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। যাঁদের জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো তাঁদের উপকারে আসলে বাংলা একাডেমী শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবে।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

প্রসঙ্গ-কথা

বাহান্নোর ভাষা-শহীদেরা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর দেখতে চেয়েছিলেন, সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে খানিকটুকু হলেও সত্য করে তোলার এক বিনীত চেষ্টা থেকে এ গ্রন্থমালা।

বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী। সবারই দাবি এর উপর। এ গ্রন্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থমালা—জ্ঞানের সব দিগন্তই যেন একদিন ছুঁতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এই প্রথমবারের মতো লিখলেন কিংবা এই প্রথমবারের মতো বাংলায় লিখলেন। আমাদের চিন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন।

আধুনিক সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে অস্তিত্ববাদ। কি এই দর্শন? কোন প্রেক্ষাপটে এ দর্শন গড়ে উঠছে? কেন তা আধুনিক মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিলো? নিরাপত্তাহীন মানব অস্তিত্বকে কি আত্মিক সমৃদ্ধিই বাঁচাতে পারে? এ-প্রশ্ন তোলা হয়েছে এ-বইয়ে।

এ গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ভাষা-শহীদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

অস্তিত্ববাদ ঃ প্রাথমিক পরিচয় ও প্রেক্ষাপট

প্রাথমিক পরিচয়

অস্তিত্ববাদ-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Existentialism, সাধারণভাবে অস্তিত্ব বিষয়ক দর্শন, মতবাদ বা চিন্তাধারা হিসেবেই অধিক পরিচিত। কিন্তু, সাধারণ পাঠক এর সত্যিকার প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তেমন কিছু জানেন বলে মনে হয় না। আবার, 'অস্তিত্ববাদ' পদটি যেহেতু ফরাসী অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সাহিত্যিক জঁ্যা-পল সার্তের নামের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত, সেহেতু অনেকে অস্তিত্ববাদ বলতে সার্তীয় দর্শনকেই শুধু বোঝেন।

সার্তীয় দর্শনে অস্তিত্ববাদ পরিণত রূপ লাভ করে। কিন্তু, সার্ত আবার অস্তিত্ববাদ ও মার্কসবাদকে সমন্বিত করে, এক ধরনের নতুন দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটান, সেহেতু সার্তীয় অস্তিত্ববাদ প্রচলিত অর্থে না অস্তিত্ববাদ, না মার্কসবাদ—বরং তাকে বলা যেতে পারে অস্তিত্ববাদের আদলে এক নতুন দর্শন। যে দর্শনের পরে, সত্যিকার অর্থে অস্তিত্ববাদের বিকাশ কোনোভাবেই আর সম্ভব নয়। এর পর অস্তিত্ববাদের ধারায় যা হবে, তা হবে সার্তীয় দর্শনের সৌধের উপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

সার্ত যেহেতু অস্তিত্ববাদ ও মার্কসবাদকে সমন্বিত করতে প্রয়াসী ছিলেন এবং নিজেও সময়ে সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে

সাধারণ মানবতাবাদী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন, সেহেতু অনেকের কাছে প্রতীয়মান হতে পারে যে, অস্তিত্ববাদ সাধারণ মানুষের মুক্তির মতবাদ, অস্তিত্ববাদ মানবতাবাদী ও বিপ্লবী মতাদর্শ। কিন্তু, গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ মতবাদ সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। আর, ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের মানদণ্ডে সব কিছু বিচার করে বলে, সামগ্রিক মানব সত্তাকে বিবেচনা করে বিশিষ্ট সত্তার অনুগামী হিসেবে। অর্থাৎ, এ মতবাদের মূলকথা হলো, ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তি মানুষ সার্বিক সত্তা বা সারধর্মের পূর্বগামী। আর, সার্বিক সত্তার অস্তিত্ব বিচার করতে হবে ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বের প্রশ্নকে প্রথমে বিবেচনা করার ভিত্তিতে।

'অস্তিত্ববাদ' বিষয়টি অতি সাম্প্রতিককালে, বিশেষভাবে সার্তের সাথে সাথে পরিচিতি লাভ করেছে। যদিও, বিষয়টি একেবারে সাম্প্রতিক নয়। দাস-যুগের গ্রীসীয় দার্শনিক সক্রেটিস সহ অনেকের চিন্তার মাঝেই এ চিন্তাধারার বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। আর, পুঁজি-বাদ-সমাজতন্ত্রের যুগে কিয়েৰ্কেগার্দ, নীটশে, ইয়েসপার্স, মার্সেল, হাইডেগার, সাহিত্যিক কামু্য, কাফকা প্রমুখ মানুষের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা ও সমীক্ষা চালানোর ফলে, প্রত্যেকে চিহ্নিত হয়েছেন অস্তিত্ববাদী হিসেবে। তবে, একটা সুস্পষ্ট দার্শনিক আন্দোলন হিসেবে অস্তিত্ববাদ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে, বিশেষভাবে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে। সে ক্ষেত্রে যার অবদান সর্বাধিক, তিনি হলেন ফরাসী দার্শনিক জঁ্যা-পল সার্ত। শুধু দার্শনিক গ্রন্থ নয়, বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ এবং গল্প, উপন্যাস, নাটক-সহ সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাকে ব্যবহার করে সার্ত অস্তিত্ববাদী দর্শনকে বিকশিত করেছেন ও ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন।

দাস যুগের গ্রীসীয় দার্শনিক প্লাটোর মতানুযায়ী বস্তুজগত বাস্তবত অস্তিত্বশীল নয়। বুর্জোয়া যুগের জার্মান দার্শনিক হেগেল চরম ভাবকে বলেছেন যথার্থ সত্য বলে। আবার তিনি ব্যক্তি সত্তার অস্তিত্বকে দেখেছেন সামগ্রিক ও সামাজিক সত্তার অংশ বা অধীনস্থ রূপে। দর্শনের ক্ষেত্রে এ ধরনের সামগ্রিকতা ও সার্বিকতাবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অস্তিত্ববাদীরা জানালেন তীব্র প্রতিবাদ। তারা প্রয়াসী হলেন চরম ভাববাদী, যুক্তিবাদী ও সামগ্রিক তথা সার্বিকতাবাদী দর্শনের বিপরীতে আপাত সত্য, ভাবাবেগ ও ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বকে আশ্রয় করে দর্শনের জগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তনে। তাদের মতে, যুক্তির জাল বুনে দার্শনিকরা শুধু কথামালাই তৈরি করতে পারেন, কিন্তু তাতে মানুষের কোনো মঙ্গল সাধিত হয় না, হতে পারে না। এ অলীক ও অবাস্তব তত্ত্বানুসন্ধানের পরিবর্তে দার্শনিকদের দায়িত্ব হওয়া উচিত মানুষকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা, মানুষের বাস্তব সমস্যাবলী সমাধানের কাজে আত্মনিয়োগ করা। আর, এক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন কিয়েৰ্কেগার্দ, ইয়েসপার্স, মার্সেল, নীটশে, হাইডেগার, সার্ত্র প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, অস্তিত্ববাদী দর্শনের সমসাময়িক কালে দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর সাথী-অনুগামীরা একান্তই যুক্তিভিত্তিক অথচ অনুশীলন হতে দূরে অবস্থানকারী দর্শন ও দার্শনিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ও বলছেন যে, শুধু যৌক্তিক বিশ্লেষণই দার্শনিকের কাজ নয়। যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাঝে দর্শনকে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ না রেখে, দার্শনিক-দের এগিয়ে আসা উচিত মানুষের বিদ্যমান সমস্যা, বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান নানাবিধ অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার ভিত্তিক অবস্থাকে নাকচ করে দিয়ে, তাকে পরিবর্তিত করায়। মার্কসীয় দার্শনিকরা কিন্তু একথা বলে সমস্যাকে শুধু চিহ্নিত করে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে ঘটনায়

দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। বরং তাঁরা ঘটনার সাথে একাত্ম হয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, করছেন। আর, তারা তা করেছেন, করছেন যথার্থ যৌক্তিকভাবেই। যদিও, অস্তিত্ববাদী সার্ত অস্তিত্ববাদ ও মার্কসীয় দর্শনের সমন্বয়ের মাধ্যমে মানুষের মঙ্গলের জন্য সর্বাত্মকভাবে প্রয়াসী ছিলেন। তবুও একথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, মার্কসীয় দর্শনের সব অনুগামী-অনুসারী যুক্তিকে যথার্থ-ভাবে তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন নি। অস্তিত্ব-বাদীদের মতে, চোখ খুললেই যে রক্তমাংসের মানুষ দেখা যায়, তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই বড়। অন্যদিকে, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা অসংখ্য ব্যক্তিসত্তার অন্তরালে লুক্কায়িত সার্বিকসত্তার বা সারধর্মের কল্পনা করেন, এবং তাকে প্রাধান্য দেন। বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তার সাধারণীকরণের ফলে আমরা সাধারণ সত্তার বা সারধর্মের সন্ধান পাই, যেমন মনুষ্যত্ব। অস্তিত্ববাদীদের কাছে তা বিমূর্তই শুধু নয়, অবাস্তব ধারণারও নামান্তর। যদিও আমরা বলবো, আরোহীপদ্ধতির ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন বিশিষ্ট সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে, তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে সাধারণ ধারণা-প্রত্যয় বিনির্মাণ করি। আর তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেই শুধু নয়, মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু, অস্তিত্ববাদীদের মতে এ ধরনের সাধারণীকরণ ও সারধর্ম বা সার্বিক ধারণা বা প্রত্যয় আকাশচারী কল্পনায় বিদ্যমান থাকলেও থাকতে পারে। বাস্তব অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণে এ ধরনের সাধারণীকরণ ভিত্তিক প্রত্যয়ের কোনো স্থান নেই। কাজেই মরুভূমির মরীচিকার মতো অলীক, অবাস্তব যে সারধর্ম বা সার্বিকসত্তা, তাকে জানার পণ্ডশ্রম না করে, বরং প্রাপঞ্চিক জগত বা ব্যক্তিসত্তায় প্রতিফলিত অস্তিত্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য জানার প্রয়াসই হওয়া উচিত দার্শনিকের প্রথম ও প্রধান প্রয়াস ও কর্তব্য।

আর এ উদ্দেশ্যেই অস্তিত্ববাদীরা দার্শনিক অনুসন্ধান ও আলোচনার মোড় সার্বিক সত্তা বা সারধর্ম হতে ব্যক্তিসত্তায়, সার্বিক ধারণা থেকে মূর্ত বস্তুতে এবং বুদ্ধিবাদ হতে প্রপঞ্চবাদ ও ব্যক্তিসত্তার আবেগ-নির্ভর মানবকল্যাণকামী চিন্তার দিকে ঘুরিয়ে দিতে প্রয়াসী ছিলেন।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কিয়ের্কেগার্দই এ দর্শনের উদ্‌গাতা। উনিশ শতকের প্রথম দিকে, খ্রীষ্ট ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি কালে তিনি এ চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটান। আর সে কারণেই, সম্ভবত খ্রীষ্ট ধর্মে নিবেদিত কিয়ের্কেগার্দ তাঁর মতবাদের স্বীকৃতি পান নি। কাণ্ট ও হেগেলের দর্শন এবং খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রভাব বলয়ে পড়ে তাঁর দর্শন তাঁর মৃত্যুর পরও প্রায় অর্ধশতাব্দী অবহেলিত থাকে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের কাছে। কিন্তু এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁর রচনাবলী জার্মানীতে অনূদিত হয়। আর তা প্রবলভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে দর্শনের জগতে। ফলে তিনি পাশ্চাত্যে নীটশে-উত্তর দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ভাববাদীদের কাছে দেবতুল্য সম্মান লাভ করেন।

কিয়ের্কেগার্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, কাণ্টের দর্শন এবং হেগেলের দ্বান্দ্বিক মতবাদ, সব কিছু ব্যক্তি মানুষের জীবনে অর্থহীন। কারণ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের উপরই ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি নির্ভরশীল। তবে একথা সত্য যে, বিদ্যমান বিষয়ই এ দর্শনের আলোচ্য বিষয় নয়। একমাত্র অস্তিত্বশীল মানবজীবনই এ দর্শনের মূল আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। অস্তিত্ববাদীরা আরো বলেন যে, অন্য সব বিষয় শুধু বিদ্যমান, কিন্তু সচেতনতার কারণে একমাত্র মানবজীবনই অস্তিত্বশীল।

অন্যদিকে প্রত্যেক মানুষই অনন্য। তাদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বাইরে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শাখাই তাকে ছকে বেঁধে বিচার করতে পারে না। আর সে কারণেই বিদ্যমান অন্য কোনো

বস্তু বা প্রাণীর সাথে রয়েছে মানব অস্তিত্বের ভিন্নতা। ব্যক্তিসত্তা চিন্তা করে, নির্বাচন করে। তার রয়েছে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও বহুবিধ অনুভূতি। আর সে কারণেই তার ভবিষ্যৎ তার কর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

হেগেলের মতে 'যা যৌক্তিক তা-ই বাস্তব, যা বাস্তব তা-ই' যৌক্তিক'। হেগেলের এ বক্তব্যকে কিয়ের্কেগার্দ হাস্যকর বলে অভিহিত করেন, এবং বাতিল বলে গণ্য করতেন। কিয়ের্কেগার্দের কাছে 'মানুষের স্বাধীনতা ও কর্ম' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার এ বিষয়ক বক্তব্যও বেশ চমকপ্রদ। তাঁর মতে কর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা ছাড়া, অহেতুকভাবে কোনো কিছু নির্বাচন করা একান্তই অর্থহীন। তার কাছে কর্মহীন বিলাসী মানব জীবনের কোনো মূল্যই নেই। তবে, তাঁর মতে একথাও সত্য যে, এ স্বাধীন নির্বাচনের মানে হলো ভালো খ্রীষ্টান হবার পথ নির্বাচন করা, কিভাবে ভালো খ্রীষ্টান হওয়া যায়, তা নির্বাচন করা। কারণ ঈশ্বর মানুষকে এ ব্রহ্মাণ্ডে পাঠিয়েছেন একমাত্র, এবং একমাত্রই খ্রীষ্টান হবার জন্যে।

একথা যেমনি সত্য যে, কিয়ের্কেগার্দের মতে মানুষের নির্বাচন মানেই ভালো খ্রীষ্টান হবার পথ নির্বাচন। অর্থাৎ তার নির্বাচন অনেকটা ভালো খ্রীষ্টান হবার মাঝেই সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, কিয়ের্কেগার্দের মতে শুধু ব্যক্তিসত্তাই বাস্তব। আর সত্য ব্যক্তিত্বেরই নামান্তর।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিক নীটশে মনে করতেন যে, ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও সিদ্ধান্তই পরম সত্য। কিয়ের্কেগার্দের দর্শনের মূল বক্তব্য ছিলো ভালো বা খাঁটি খ্রীষ্টান হবার উপায় বিষয়ক। কিন্তু, নীটশের দর্শনে খ্রীষ্টান হবার উপায় তো দূরের কথা, ঈশ্বরের বিদ্যমানতাই ছিলো না। তাঁর কাছে ঈশ্বর ছিলেন

'মৃত'। তাই তাঁর মূল প্রয়াস ছিলো যথার্থ নাস্তিক হবার এবং নাস্তিক হিসেবে টিকে থাকার প্রতি। যদিও, দুজনই ভেবেছেন মানব অস্তিত্ব, তথা ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে। তবে, নীটশের মতে মানব-জীবন যুক্তির ঊর্ধ্বে।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ইয়েসপার্সের মতে, অস্তিত্ববাদ হলো মানবিক অবস্থা, মানুষের সীমাবদ্ধ অবস্থা। তার মতানুসারে, অস্তিত্বশীল হবার অর্থ হলো একটা দৈহিক অবস্থার মাঝে নিক্ষিপ্ত হওয়া, যা ব্যক্তি নিজে নির্বাচন না করলেও, সে তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ, ব্যক্তির পক্ষে কখনোই নিজেকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্বই তাকে নির্বাচন করার স্বাধীনতা প্রদান করে। আর তার ফলে অস্তিত্বশীল সত্তা হয়ে ওঠে দায়িত্ববান। সত্যিকারভাবে নির্বাচন করা একটি সঠিক যুক্তির তুলনায় কোনোক্রমেই কম মূল্যবান নয়। তবে, এ নির্বাচনে স্বেচ্ছাচারী হওয়া অবশ্যই ঠিক নয়। তার পরও বলা যায়, ভাষাসহ বিবিধ মাধ্যম ব্যবহার করে মানব অস্তিত্বই বাকী সবার সাথে সংযোগ স্থাপন করে। অন্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করার ভিত্তিতে নিজেকে অতিক্রম করার ফলেই সত্য বেরিয়ে আসে। কারণ, কোনো শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব না থাকার কারণে কোনো মানুষই নিজের প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সে সবার কাছেই প্রবেশের অধিকারী, আবার সবার কাছেই দায়ী।

ইয়েসপার্স তাঁর 'দর্শন' গ্রন্থে বলেছেন যে, অস্তিত্বকে উদ্ভাসিত করা একদিকে বিষয়গত চিন্তা, অন্যদিকে বিষয়গত জ্ঞান। মূল কথা হলো অযৌক্তিকতার ভ্রান্তি এড়িয়ে অস্তিত্বকে বিষয় **না ভেবে** কিভাবে তার সম্পর্কে ভাবা যায়, তা।

'ম্যান ইন দ্য মডার্ন এজ' গ্রন্থে তিনি শুধু অস্তিত্ববাদের সংজ্ঞাই নির্ধারণ করেন নি, বরং কারিগরীবিদ্যার অগ্রগতিকে মানবসভ্যতার

অস্তিত্বের প্রতি শঙ্কা রূপেই গণ্য করেছেন। তার মতে মার্কস ও ফ্রয়েডের তুলনায় সক্রেটিস, বুদ্ধ, কনুফুসিয়াস, যিশু ছিলেন অধিক প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিক। তাই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির তুলনায় ধর্মীয়, বিশেষভাবে খ্রীষ্টধর্মের অগ্রগতিই মানব জাতির জন্য বেশি কল্যাণকর।

জার্মান দার্শনিক হাইডেগারের 'বিয়িং এণ্ড টাইম' (১৯৪৭) প্রকাশিত হলে, জার্মান দর্শনের জগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ গ্রন্থে তিনিও অস্তিত্বের অর্থ নিরূপণে প্রয়াসী হন। তাঁর মতে মানুষের অস্তিত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে উচিত বিমূর্ত বিষয়কে বাদ দিয়ে মানুষের অবস্থা ও অবস্থান, উদ্দেশ্য ও মনোভাব প্রভৃতি ব্যবহারিক দিককে গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হওয়া। এরূপ বিবেচনায় মানব অস্তিত্ব উদ্বেগ ও ভয়ের। কারণ তা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শূন্যতায় বিলীন হয়। অন্যদিকে তিনি বলেন যে, বিশ শতকে পৃথিবীর কোথাও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও, 'ঈশ্বর এখন মৃত'। কবিতাসহ বিবিধ কল্পনাপ্রধান বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বরের কথা প্রচার করা হয় সত্য, কিন্তু মানুষের অস্তিত্বের সমাধানের জন্য মানুষের বাইরে কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই। সম্ভবত এসব কারণেই বিশ্বযুদ্ধোত্তর ধ্বংসস্তূপসম জার্মানীতে হাই-ডেগারের চিন্তাধারা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়।

মানব অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট দুশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি, বিবেক, মৃত্যু-চিন্তা সহ বিবিধ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন হাইডেগার। আর শেষ পর্যন্ত তিনি সব কিছুর পরিণতি দেখেছেন 'শূন্যতার' মাঝে। 'মানুষ অবশ্যই মারা যাবে', মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এ বোধের গুরুত্ব রয়েছে। তবে অন্যের মৃত্যু দেখা বা উপলব্ধি করা, আর নিজের মরা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। একজন মানুষ নিজের মৃত্যুতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার হয়ে অন্য কারো মৃত্যু বরণ করার উপায়

নেই, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর সব শক্তি ও সম্ভাবনা, এমন কি সে নিজেও শেষ হয়ে যাবে, এ বোধের মধ্য দিয়েই সে তার অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পেতে পারে।

হাইডেগারের মতে, অপরাধবোধ ও বিবেকের মাধ্যমেও মানুষ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। বিবেককে কখনোই 'খোদার বাণী', 'মানব জাতির কণ্ঠস্বর' প্রভৃতি অর্থহীন কথা বলে মোটেই খাটো করা উচিত নয়। দুশ্চিন্তা ও ভয়ের অনুভূতির ব্যাখ্যা করতে গিয়েও তিনি পোঁছেছেন 'শূন্যতার' ধারণায়। তাঁর মতে আমাদের দুশ্চিন্তা, তাড়না বা বিবেক বলে কিছু নেই।

দর্শনের ক্ষেত্রে হাইডেগার অস্তিত্ববাদী রূপে চিহ্নিত হলেও, তিনি নিজে কিন্তু অস্তিত্ববাদী হিসেবে চিহ্নিত হতে কুণ্ঠিত ছিলেন। অন্য-দিকে, তিনি সামগ্রিক সত্তার অস্তিত্ব নিয়েই বেশি ভেবেছেন, বিশিষ্ট সত্তার অস্তিত্ব নিয়ে নয়।

ফরাসী দার্শনিক মার্সেলও দর্শনের জগতে অস্তিত্ববাদী বলে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে মেটাফিজিক্যাল জার্ণালে' তার দর্শন প্রচারিত হয়। তিনি সার্ত্রের তুলনায় বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। অন্য-দিকে তিনিই প্রথম হুসার্ল, ইয়েসপার্স ও হাইডেগারের চিন্তাধারা ফরাসী দেশে প্রচার করেন। তাছাড়া তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণে বিদ্যমান মৌলিকত্বের কারণে তিনি সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে ফরাসী দেশে সম্মানও পেয়েছিলেন। যদিও সার্ত্রের বিপুল উপস্থিতির কারণে মার্সেলের অবস্থান অনেকটা ম্লান হয়েই ছিলো। তবুও একথা সত্য যে, খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল আনুগত্য ছিলো। আর সে কারণেই তিনি একবার নিজেকে অস্তিত্ববাদী বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

ফরাসী তরুণরা বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যখন বৃত্তাবদ্ধ ও দিশেহারা এবং যুদ্ধের ভয়াবহতায় বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই উচ্চারিত হলো, মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তার স্বীয় অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তুলতে সে সক্ষম, এবং সে স্বাধীন। আর 'জার্মানীর অধিকৃত অবস্থায় আমরা যতটা স্বাধীন ছিলাম, ততটা কখনোই ছিলাম না।' এ অভয় বাণীই শুনিয়েছেন ফরাসী দেশের প্রখ্যাত দার্শনিক এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান পুরুষ জ্যাঁ-পল সার্ত।

তাঁর মতে মানুষ যেন সব দিক থেকে ক্রমাগত চাপের সম্মুখীন। অর্থহীন এ পৃথিবীতেই তার বাস। কিন্তু এখানেও তার ভাগ্যের ও জীবনের নিয়ন্ত্রক সে নিজেই। এ প্রশ্নে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার চিন্তা করা অবান্তর মাত্র। কারণ তার অস্তিত্বের যে কোনো চরম অবস্থায় সে যে একেবারেই অসহায়। এরূপ অবস্থায় কোনো শক্তিই তার কোনো প্রয়োজনে আসতে পারে না। সে নিজেকে যতটুকু রক্ষা করতে পারে, তার তুলনায় সামান্য সাহায্যও অন্য কোনো শক্তি তাকে করতে পারে না। আর মানুষ কর্মের জন্য নিজের ও সহযাত্রীদের কাছে দায়ী। তাই, এ কারণে সে যুগপৎ নিজের ও অন্যের জন্য যেমন স্বাধীন, তেমনি দায়িত্বশীল।

সার্ত মানুষের ব্যক্তি-মর্যাদা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি অনুগত থাকার কারণে অন্য কোনো বিমূর্ত ও অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন নি। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, মানুষ প্রথমে অস্তিত্বশীল হবার পরই ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করে। এখানে ব্যক্তির অস্তিত্বশীল হওয়াই মুখ্য। অন্যদিকে, মানুষ স্বাধীন ও সচেতন কর্মের জন্য দায়ী বলে, সে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তা নিয়ন্ত্রিত নয়, সে শুধু বিবেক দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এ ক্ষেত্রে পরমাত্মা বা ঈশ্বর নয়, বরং মানুষের স্বাধীন প্রয়াসই গুরুত্বপূর্ণ।

এতক্ষণের আলোচনার ভিত্তিতে বলা চলে যে, বিভিন্ন অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের মধ্যে নানা মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের মূল বক্তব্য যে-ক্ষেত্রে এক, তাহলো : ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব সার্বিক সত্তা বা সারধর্মের পূর্বগামী। অন্যদিকে একথাও উল্লেখ্য যে, অস্তিত্ববাদ সব সময়েই ব্যক্তি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও মূল্যায়নকে সামগ্রিক মানবজাতির জীবনের উদ্দেশ্য ও মূল্যায়নের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দেয়। অন্যভাবে এ কথাও বলা চলে যে, এ মতবাদ ব্যক্তিমানুষের স্বার্থ, তার চিন্তা-ভাবনা, সমস্যা তথা অস্তিত্বের বিবিধ বিষয়কে সর্বাগ্রে স্থান দেয়, অগ্রাধিকার প্রদান করে।

তবে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, অস্তিত্ববাদী বলে যেসব দার্শনিককে চিহ্নিত করা হয়, তাদের মাঝে প্রচুর মতপার্থক্যও বিদ্যমান। আর সম্ভবত: এসব অনৈক্যের কারণেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান প্রবক্তা ; ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্ত বলেছিলেন যে, অস্তিত্ববাদ শব্দটি এখন আর কোনো অর্থই প্রকাশ করে না। সত্যি কথা বলতে কি, যেসব লেখককে সাধারণভাবে অস্তিত্ববাদী বলা হয়, তাদের প্রত্যেকের চিন্তা-চেতনা এত বেশি স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ যে, তাদের একই সম্প্রদায়ভুক্ত করা আসলেই কষ্টকর। তা সত্ত্বেও এসব দার্শনিকের চিন্তাধারার মধ্যে যে মতৈক্য খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলো :

ক. এ সম্প্রদায়ের প্রায় সব দার্শনিকই ব্যক্তিসত্তার পূর্বে সার্বিক বা সাধারণ সত্তা কিংবা সারধর্মকে স্বীকার করার বিরোধী। তাঁদের মতে, ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব সার্বিকসত্তা বা সারধর্মের পূর্বগামী।

খ. নৈতিকতা বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদীরা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক। যদিও এ ধরনের প্রত্যয়বোধ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। আর তা সর্বপ্রথম কিয়ের্কেগার্দের চিন্তাধারার মাঝেই লক্ষ্য করা যায়।

গ. জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় অস্তিত্ববাদীরা সাধারণত বিষয়গত ও যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতির বিরোধী। কারণ, তাঁরা তাঁদের বিষয়ীভিত্তিকতা বা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিণতিতেই কোনো কিছু জানা বা আলোচনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন অতিমাত্রায় আত্মিকতার আশ্রয়।

ঘ. জানার প্রতি অনুরাগ প্রকাশের চেয়ে এ সম্প্রদায় অস্তিত্বশীল হবার প্রতিই বেশি আগ্রহী। তাই, তাঁরা আদি সত্তা, সার্বিক সত্তা বা সারধর্ম প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনায় শুধু অনুৎসাহীই নন, বরং গভীর যুক্তিভিত্তিক আলোচনার বিরোধীও।

প্রেক্ষাপট

বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাপর সময়ে ফ্রান্স ও জার্মানীর তরুণ মানসে, পাশ্চাত্য দর্শনের অবক্ষয়ী ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রূপে যে দর্শন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো এবং নতুন জীবনবোধ সম্পন্ন দার্শনিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছিলো, দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে তা-ই অস্তিত্ববাদ নামে পরিচিত।

অস্তিত্ববাদীদের এ বিদ্রোহী চিন্তাধারার মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব থাকলেও তা সত্যিকার অর্থে, যৌক্তিক বিচারে কোনো নতুন ও যুগোপযোগী দর্শন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে কি-না, কোনো দার্শনিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছে কি-না, তা গভীরভাবেই বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস অস্তিত্ববাদ জীবন-ধারা ও জীবনবোধের কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে জীবনের উন্নতি বিধানে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, একটা 'নতুন' চিন্তা-ধারা হিসেবে অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ মতবাদ পাশ্চাত্যের চিন্তার জগতে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। শুধু তাই নয়, আজকের

যুগে বিশ্বের অনেক দেশেই মার্কসীয় দর্শনের বিকল্প রূপে, অবক্ষয়ী মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে এ দর্শনকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। চিন্তা জগতের এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। সার্তের প্রয়াসের ফলে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিপরীতে কিংবা সম্পূরক হিসেবে অস্তিত্ববাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষভাবে পাশ্চাত্যের বিক্ষুব্ধ তরুণ মানসকে যে আলোড়িত করতে পেরেছিলো তা অস্বীকার করা যায় না। যদিও, দ্বান্দ্বিক তথা যৌক্তিক বিচারে লক্ষ্য করা যায়, এ দর্শন সামাজিক ও বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে পারে না, দার্শনিক আন্দোলন হিসেবে কোনো যৌক্তিক পরিণতি লাভও করতে পারে না। জীবনবোধ পরিবর্তনের জন্য যা-ই বলুক-না-কেন, সে ক্ষেত্রেও কোনোরূপ অবদান রাখতে সক্ষম নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ ধরনের দার্শনিক চিন্তাধারা উদ্ভবের ও আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবার প্রেক্ষাপট কি? যে কোনো দার্শনিক চিন্তাধারার জন্ম লাভের পেছনে কোনো-না-কোনো ভিত্তি থাকে।

প্রথমত একটা প্রবহমান চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়া হিসেবে একটা নতুন চিন্তাধারা জন্ম লাভ করতে পারে। কারণ প্রতিক্রিয়ার এবং সমন্বয়ের পথ ধরেই এগিয়ে চলে চিন্তা-চেতনা। একটা দার্শনিক চিন্তাধারার উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি প্রযোজ্য। অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই জন্মলাভ করে, এবং প্রতিকূল পরিবেশ পেলে বিকশিত হয় কোনো নতুন চিন্তাধারা তথা দর্শন।

দ্বিতীয়ত বিশ্বের নিয়ত পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তাধারার মাঝেও পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তিত পরিবেশের প্রেক্ষিতে চিন্তাবিদ্‌রা বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ চিন্তা করে থাকেন। তারই ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় নতুন চিন্তাধারা, নতুন দর্শন। সে নতুন

চিন্তাধারার যদি প্রয়োজনীয় ও যৌক্তিক ভিত্তি থাকে; তাহলেই তাকে স্বীকার করে নিতে হয় আগত চিন্তাধারা তথা দর্শন হিসেবে।

আমরা জানি, অস্তিত্ববাদের যৌক্তিক ভিত্তি দুর্বল হলেও, প্রত্যাশায় রয়েছে মানবকল্যাণ। যদিও অনেকের মতে, অস্তিত্ববাদ দর্শনের প্রচলিত ধারা ও বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ। তারা আরো মনে করেন যে, প্রাচীন গ্রীসীয় অনুধ্যানী দর্শন, সামন্ত যুগীয় পণ্ডিতি দর্শন ও বুর্জোয়া যুগের কান্ট-হেগেলের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ হিসেবেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ। উপরোক্ত বক্তব্য অংশত সত্যও। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দর্শনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সামগ্রিকভাবে সমাজকে নিয়ে ভাবার প্রশ্নে একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া কোনো বিদ্রোহই তার পরিণতিতে পৌঁছতে কিংবা কোনো কিছুর যৌক্তিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। এ ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রসূত বিদ্রোহ নিজ পরিসরে, এমন কি পারিপার্শ্বিক অবস্থানেও ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধজনিত হতাশা সৃষ্টি করে থাকে।

তাছাড়া আরো লক্ষ্য করা যায়, বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত ইউরোপে বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয়ের নিগড়ে মানুষের স্বাভাবিক ও স্বাধীন চিন্তার পথ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। বুর্জোয়া চিন্তা-ধারার পরিবর্তে বিকাশ লাভ করতে থাকে মার্কসীয় চিন্তা-চেতনা— মার্কসীয় দর্শন। বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় অবক্ষয়ী অবস্থার। ফলে সে সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব তথা মানসিকতা পতিত হয় সমস্যার সাগরে। সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অগভীর মানসগুলো নিপতিত হয় প্রবল হতাশার মধ্যে। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে কতিপয় দার্শনিক অনুধাবন করলেন যে, চিন্তার ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদ, আদর্শবাদ, সার্বিকতাবাদ প্রভৃতির মধ্যে

ব্যক্তিক মানুষকে যেভাবে সমষ্টির অধীন রূপে বিবেচনা করা হয়েছে, তার ফলে সমগ্রের মাঝে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে ব্যক্তির স্বার্থকে। এসব দার্শনিকের বিপর্যস্ত মানসিকতার মাঝে বিদ্যমান দুর্বল যুক্তিসম্পন্ন ও আবেগপ্রবণ, অস্থির ও অবৈজ্ঞানিক অথচ মানব কল্যাণকামী চিন্তার ফসল রূপেই উদ্ভূত হলো অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা তথা দর্শন।

আগেই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, পুঁজিবাদী সভ্যতা ও বুর্জোয়া মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাঝেই সৃষ্টি হয়েছে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিক অস্তিত্বের চিন্তা-চেতনা, অস্তিত্ববাদী দর্শন। বিষয়টা আরো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অনেক দেশই, বিশেষভাবে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ সত্যিকার অর্থে পুঁজিবাদী সমাজ বা বুর্জোয়া সভ্যতার সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করতে পারে নি। পুঁজিবাদী সভ্যতা ও অর্থনীতি তাদের কাছে এসেছে আগ্রাসী ভূমিকায়, শাসক-শোষক রূপে। এসব দেশের সাধারণ মানুষের চেতনায় পুঁজিবাদ ধরা দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ বা অর্থনৈতিক প্রভু হিসেবে। এসব দেশ পুঁজিবাদকে প্রত্যক্ষ করেছে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের নায়ক, কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আগ্রাসনের নায়ক হিসেবে। এসব দেশের সচেতন জনগণের কাছে পুঁজিবাদ বা বুর্জোয়া সভ্যতার বিশেষ কোনো গতিশীল ভূমিকা নেই। তাই, পুঁজিবাদ বা বুর্জোয়া সভ্যতার অবক্ষয় বা সংকটে এসব দেশের জনগণের বিচলিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পাশ্চাত্যের ব্যাপারটা ভিন্ন। সেখানে সমাজের গতিধারায় দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে সামন্তবাদী সমাজের পতন ঘটেছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিবাদী সমাজ। এর সাথে সাথে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে বুর্জোয়া তথা গণতান্ত্রিক ও ইহজাগতিক চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, দর্শন। এসব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক

ক্ষেত্রেও আসে আমূল পরিবর্তন, অভাবনীয় অগ্রগতি। জনগণ লাভ করে গণতান্ত্রিক অধিকার। সে বিচারে দেখা যায় পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদী সভ্যতার অবদান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজ বিকাশের গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় কোনো সমাজ, কোনো সভ্যতাই আবহমানকাল ধরে টিকে থাকে না, থাকে নি। দাস সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে সামন্তবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়ে, কয়েক শতাব্দী যেতে না যেতেই সে সামন্তবাদী সমাজ হয়ে পড়ে অচল এবং প্রতিক্রিয়াশীল। তাই নতুন প্রেক্ষাপটে আবার নতুনভাবে সংগ্রামের প্রয়োজন পড়ে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে আবার সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় পুঁজিবাদী সমাজ ও সভ্যতা। তা-ও আর বেশি দিন গতিশীল থাকতে পারলো না; হয়ে পড়লো অচল ও প্রতিক্রিয়াশীল। কোথাও তা উত্তরিত হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজে। যেখানে এ উত্তরণ ব্যর্থ হলো, সেখানে তা পতিত হলো দারুণ সংকটে। পুঁজিবাদী দেশগুলোর নায়করা তখন নিজেদের সংকট কাটানোর এবং নিজ দেশের সমস্যা ও অবক্ষয় এড়ানোর জন্য শুরু করলো বিকশিত পুঁজিবাদের স্বাভাবিক চরিত্র অনুযায়ী অনুন্নত দেশগুলো দখল করতে। এক সময়ে এ প্রক্রিয়াও সম্মুখীন হলো সংকটের। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তিকামী জনতার প্রতিরোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করলো। পুঁজিবাদী সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি হলো, তাদেরই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতিতে। এসব দেশের সচেতন ও সৃজনশীল মানুষ এ অবস্থায় নিজেদের জীবনকে বিপন্ন ভাবতে শুরু করলো। জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এরূপ সংকট হতে আবেগপ্রবণ মানসে জন্ম নিলো বিচ্ছিন্নতাবোধ জনিত আস্তিকতা। তাদের চেতনা বিপর্যস্ত হলো হতাশার কারণে। এমনি নৈরাশ্য, বিচ্ছিন্নতাবোধ,

আস্তিকতা প্রভৃতির ফলশ্রুতিতে অগভীর কল্পনাপ্রবণ চেতনায় সঙ্কটময় অবস্থা ধরা পড়লো ব্যক্তিক সত্তার পরাজয়, নির্বাসন ও ধ্বংস রূপে। ফলে মানবকল্যাণকামী ও স্বাধীনতা প্রিয় অথচ অগভীর চিন্তাবিলাসী, আবেগপ্রবণ তথা দুর্বল যুক্তিসম্পন্ন যেসব দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব ঘটে, অস্তিত্ববাদ সে সবের মাঝে অধিক উল্লেখযোগ্য। এ দর্শনের পরিণত রূপ লাভ করে ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্তের হাতে। তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ ও মানবতাবোধের সমন্বয় ঘটানোর প্রত্যাশা থেকে তিনি মার্কসীয় দর্শন ও অস্তিত্ববাদের সমন্বয়েও প্রয়াসী হন। যদিও তা অবাস্তব বলে, শেষ পর্যন্ত সার্তীয় অস্তিত্ববাদ অস্তিত্ববাদের মূল ধারা থেকে সরে যায় এবং সমন্বয়ের প্রয়াসে স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়।

অথচ একই প্রেক্ষাপটে, পুঁজিবাদী সভ্যতার সঙ্কট থেকে যাঁরা মুক্তি খুঁজছিলেন বাস্তবতার ভিত্তিতে, সামাজিক জীবন যাপনের মাধ্যমে সমাজকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করে, প্রতিটি সামাজিক সঙ্কটকে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টনের সঙ্কট বলে বিবেচনা করে, তাদের চিন্তা-চেতনারভিত্তিতে বিকশিত দর্শন কিন্তু সামগ্রিক সমাজেরই মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে। এ সঙ্কট ও নানাবিধ ভাববাদী দর্শনের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিচার করে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস যে দর্শনের, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উদ্ভব ঘটান তা সামগ্রিক অর্থেই মুক্তির বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক পথের কথা বলে এবং তাকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হবার পথ দেখায়। সে কারণেই পুঁজিবাদী সঙ্কট হতে সৃষ্ট মার্কসীয় দর্শনকে শাসকরা যতটা ভয় পায়, অস্তিত্ববাদকে ততটা পায় না। পরোক্ষে পৃষ্ঠপোষকতাও করে থাকতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আলজেরীয় মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দ্য গল সরকারের সমালোচনা করে সার্ত সহ কয়েকজন মননশীল ব্যক্তিত্ব একটা ইশতেহার প্রকাশ করলে, সার্তবাদে

বাকী সবাইকে বন্দী করে দ্যগল সরকার। কিন্তু সার্তকে বন্দী করে নি।

সার্তের প্রতি দ্য গল সরকারের এ ধরনের অনুকম্পায় সার্তের চেতনার প্রতিক্রিয়া জানি না। তবে আমরা একথা ভাবতে পারি যে, সার্ত যদি **তৎকালীন** বিদ্যমান ব্যবস্থা ও সরকারের প্রতি প্রবল হুমকি হতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই অনুকম্পা পেতেন না। কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সরকার তো কোথাও তা করে বলে আমরা জানি না। আর মার্কসকে তো এ কারণেই ঘুরতে হয়েছে দেশ-দেশান্তরে। কিন্তু সার্তের অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্নতাবোধাক্রান্ত বিদ্রোহী চিন্তা-চেতনার পরিণাম সম্পর্কে ফরাসী সরকার খুব সচেতন ছিলো বলেই তাকে পরোক্ষে ব্যবহার করতে পেরেছে মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে, প্রদান করেছে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার।

সে যা-ই হোক, এসব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, সব সঙ্কট সব মানুষের কাছে একইভাবে ধরা পড়ে না। সবার চিন্তা-চেতনাও প্রবাহিত হয় না একই ধারায়। সে কারণেই একই সঙ্কটের মাঝে উদ্ভূত মার্কসীয় ও অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রবাহিত হয়েছে বিপরীত ধারায়। সে কারণেই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি, ঘটনা বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া, নির্ধারিত কর্ম পন্থা—প্রায় সব কিছুই পরিচালিত হয়েছে বিপরীত স্রোতে। বিশ্বের মানুষের কাছে তাই উভয়ের আবেদন ও অবদান ভিন্ন।

অস্তিত্ববাদ: দার্শনিক ও দর্শন

সোরেন কিয়েৰ্কেগার্দ

সোরেন কিয়ের্কেগার্দের (১৮১৩— ৫৩) জন্ম ডেনমার্কের কোপেন-হেগে। জন্মগতভাবেই তিনি ছিলেন দৈহিক দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। এজন্য তিনি ভুগছিলেন বিষাদের গ্লানিতে। যদিও এর কারণ হিসেবে অন্য কাউকে দায়ী না-করে, নিজেকেই দায়ী করেছিলেন।

তাঁর পিতা বাল্যকালে পশুচারণের সময়ে ক্ষুধা ও অভাবের জন্য ঈশ্বরকে নাকি দোষারোপ করে গালি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এজন্য পাপ বোধ করেন। কিন্তু, এ কথা ভুলতে পারেন নি। তাই সারা জীবন কাটান বিষণ্ণতাক্রান্ত ও হতাশাগ্রস্তভাবে। কিয়ের্কে-গার্দের ধারণা, সন্তান পিতার দর্পণ। তাই বিষণ্ণ ও হতাশাগ্রস্ত পিতার সন্তানরূপে তিনি পিতার বিষণ্ণতা, দুঃখবোধ, পাপগ্রস্ততা, হতাশা প্রভৃতির অংশীদার ও শিকার।

এ ধরনের মানসিক যাতনার কারণে সারাজীবন বিষণ্ণ থাকলেও বুদ্ধির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তাই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সাথেই হেগেলের সার্বিক ভাববাদী দর্শনের বিপরীতে উদ্ভাবন করেন এক ধরনের আত্মিক ভাববাদী দর্শনের। যার মূলকথা: অস্তিত্ব বুদ্ধি-নির্ভর নয়; ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা, ভাবাবেগ ও অনুভূতিনির্ভর।

তাঁর পিতা প্রায়ই যিশুখ্রীষ্টকে ভালোবাসার জন্য তাঁকে উপদেশ দিতেন। তাই ছেলেবেলায়ই তিনি পিতার প্রভাবে ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তা সত্ত্বেও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিলো ভয় মিশ্রিত। কারণ তাকে সব সময়েই যে বিষয়টি পীড়িত করতো, তা-হলো তাঁর পিতা কর্তৃক ঈশ্বরকে গালি দেয়া এবং মা ও ভাই-বোনের অকাল মৃত্যু। তাই ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো ভীতি তাড়িত।

খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি এ মনোভাব তাঁর ব্যক্তিক ও দার্শনিক জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। দৈহিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ থাকলেও, তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব এক সুন্দরী মহিলাকে আকৃষ্ট করে। তাঁদের মাঝে বাকদান পর্ব শেষ হয়। কিন্তু তিনি তখন গভীর-ভাবে মানসিক দ্বন্দ্বে ও অসুস্থতায় ভুগতে থাকেন। একদিকে সুন্দরী মহিলাকে তিনি হারাতে চান নি। অন্যদিকে বিয়ে করার পর সত্যি-কারভাবে ধর্মীয় জীবনযাপন করা অসম্ভব। তিনি হয়তো প্রত্যাশা করেছিলেন যে, ইব্রাহিম যেমন পুত্র ইসমাইলকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করতে গিয়ে জীবিত পুত্র ও ঈশ্বরের করুণা দুই-ই পেয়েছেন, তিনিও হয়তো তা পাবেন। তাই তিনি বিয়ে করা থেকে বিরত থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বাকদত্তা সুন্দরী মহিলাকেও হারান।

সম্ভবত জীবনের বিষণ্ণতাবোধ ভুলে থাকার জন্য তিনি এক সময়ে পিতার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করেন এবং ভোগ-বিলাসের মাঝে জীবনের বেশকিছু সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি জীবনের প্রতিও আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এ ধরনের জীবনের অর্থহীনতা উপলব্ধি করে সামাজিকভাবে দায়িত্ব পালনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এরপর তিনি সম্পূর্ণভাবেই খ্রীষ্টান ধর্মে নিজেকে উৎসর্গ করে এবং একজন আদর্শ খ্রীষ্টান রূপে জীবনযাপনে প্রয়াসী হন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই তিনি জীবনকে তিনটি

পর্যায়ভুক্ত করেন। সেগুলো হলো : ভোগ বিলাসের পর্যায়, নৈতিকতার পর্যায় এবং ধর্মবোধের পর্যায়।

কিয়েকেগার্দের মতে ভোগ বিলাসের পর্যায়ে মানুষ ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝেই মগ্ন থাকে। কিন্তু এ জীবন কোনোভাবেই মানবিক জীবন নয়। এরূপ জীবন মানুষকে এক পর্যায়ে চরম হতাশার মাঝে নিক্ষিপ্ত করে। তাই এ হতাশযুক্ত একঘেয়েমি ও ক্লান্তিকর জীবনই শেষ পর্যন্ত মানুষকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যে পর্যায়ে মানুষ নিজের সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করে। ভোগ-সর্বস্ব মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে, জীবনের মূল্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মারাত্মকভাবে সন্দেহ পোষণ করতে থাকে।

ভোগ-বিলাসের পর্যায়ের প্রতি ব্যক্তির অনাস্থাই তাঁকে দ্বিতীয় অর্থাৎ নৈতিকতার স্তরে উপনীত করে। এ পর্যায়ে মানুষ দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। বিবাহ, বন্ধুত্ব ও কর্ম বা পেশার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। কিন্তু, কিয়েকেগার্দ এই নৈতিকতার পর্যায়কেও সত্যিকার অর্থে অস্তিত্বের স্তর বলে মনে করতেন না। কারণ ভোগের জীবন হতাশায় পরিপূর্ণ। আর নৈতিকতার জীবন সমাজের সাথে ব্যক্তির এবং নিজের সাথে নিজের দ্বন্দ্বের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তাঁর মতে নৈতিকতার পর্যায়ে ব্যক্তি যেহেতু বিয়ে, বন্ধুত্ব ও কর্মের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; তাই এ নৈতিকতা সর্বকালে সবার জন্য প্রযোজ্য। আর সে কারণেই নৈতিকতার রয়েছে একটা সামগ্রিক বা সার্বিক দিক। কিন্তু সার্বিকতার মাঝে নিজকে প্রকাশ করার অর্থ হলো ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন দেয়া। এ অবস্থায় ব্যক্তি যদি সার্বিকতার মাঝে নিজকে প্রকাশ না করে, তাহলে সার্বিকতা হতে দূরে সরে যাবার কারণে অভিযুক্ত হয় বা অপরাধবোধ দ্বারা আক্রান্ত হয়। আবার সে যদি ব্যক্তিসত্তাকে অর্থাৎ ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্যকে সার্বিকসত্তার মাঝে বিলীন

করে দেয়, তাহলেও সে অপরাধবোধ হতে মুক্ত হতে পারে না। কারণ যথার্থ অস্তিত্বের জন্য যা তাঁর করণীয়, সে তা হতে বিচ্যুত হয়। এ কারণে কিয়ের্কেগার্দের কাছে নৈতিকতার পর্যায়ও ব্যর্থতার পর্যায় রূপে পরিগণিত হয়।

তাই কিয়ের্কেগার্দের মতে তৃতীয় বা ধর্মীয় পর্যায়ই জীবনের' যথার্থ পর্যায়। নৈতিক স্তরে কোনো ঘটনা বেঠিক বলে পরিগণিত হতে পারে। যেমনঃ ইব্রাহিম কর্তৃক তার পুত্রকে হত্যার উদ্যোগ। কিন্তু ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হবে ঘটনাটি অবশ্যই যথার্থ। কারণ এরূপ ঘটনা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যেরই প্রমাণ। আর এ কারণেও ধর্মীয় পর্যায় জীবনের সর্বোত্তম পর্যায়।

খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি কিয়ের্কেগার্দের অবিচল আস্থা থাকা সত্ত্বেও, তিনি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং তিনি এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতার বিরোধীই ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, যথার্থ খ্রীষ্টান হবার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো আন্তরিকতা সততা ও নিষ্ঠার সাথে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে খ্রীষ্টের সাথে একাত্মতার ধারণা নিয়ে আত্মত্যাগের মাধ্যমে ব্যক্তির যথার্থ **অস্তিত্বকে** প্রকাশ করা।

কিয়ের্কেগার্দের দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য হলো কিভাবে ধার্মিক হওয়া যায়, কিভাবে ভাল খ্রীষ্টান হওয়া যায়। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলোঃ আমরা সবাই আদমের বংশধর। আদম ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে যে পাপ করেছেন, আমরাও তাঁর বংশধর হিসেবে সে পাপের অংশীদার। সেই প্রাচীন বা আদিম পাপের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের প্রয়াস নিতে হবে ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হতে। সেজন্যই শর্তহীন ও পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রয়োজনে ভালো খ্রীষ্টান হয়ে খ্রীষ্টের পথ অনুসরণ করতে হবে। এ পথ

ছাড়া কেউ ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত হতে পারবে না, আর আদিম পাপের হাত থেকেও মুক্তি পাবে না।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কিয়েৰ্কেগার্দের দর্শনে খ্রীষ্টান ধর্ম, ঈশ্বর ও শাশ্বত সত্য অভিন্নরূপে বিদ্যমান। কারণ কিয়েৰ্কেগার্দ ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না, বরং বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের আত্মিক অস্তিত্বে। আসলে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের আত্মিকতার দিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, আর সে কারণেই তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সত্য আত্মিকতার মাঝেই নিহিত। তাঁর মতে, সত্য তথা খ্রীষ্টান ধর্মকে আমরা বিষয়গত বা বাস্তবভাবে জানার চেষ্টা করলে, আমরা অনিশ্চিত ধারণা লাভ করতে পারলেও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারি না। তাই আমাদের করণীয় হলো খ্রীষ্টান ধর্মকে বিষয়গতভাবে জানার চেষ্টা না করে, প্রবল ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে আত্মিকভাবে জানার চেষ্টা করা। কেননা, ভক্তের হৃদয় দিয়ে চেষ্টা করলেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে, ঈশ্বর, খ্রীষ্টান ধর্ম ও শাশ্বত সত্য এক এবং অভিন্ন। এ উপলব্ধির পর্যায়ই হলো সত্যিকার অর্থে অস্তিত্বের পর্যায়।

এমনিভাবে ধর্ম, শাশ্বত সত্য ও ঈশ্বরানুভূতির যে স্তর, কিয়ের্কেগার্দের মতে, সে স্তরে ভক্তের সাথে ঈশ্বরের নিবিড় যোগ সাধিত হয়। এ স্তরে যুক্তির কোনো স্থান নেই। এখানে স্থান রয়েছে ভয়, যন্ত্রণা, প্রেম, বিশ্বাস ও অন্তরঙ্গ যোগাযোগ এবং নিবিড় প্রার্থনার—আত্মিকভাবে ঈশ্বর, ধর্ম ও শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধির। আর এ আত্মিক স্তরেই ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে, তাঁর অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে এক ধরনের সচেতনতা লাভ করে এবং প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়।

এ স্তরে সত্য হয়ে পড়ে ব্যক্তির অনুভূতি-নির্ভর। এ ধরনের চিন্তা বা অনুভূতি অবশ্যই অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। আর অস্তিত্ব

মানেই হলো অস্তিত্ববান মানুষ, ব্যক্তি মানুষ। সে কারণেই তিনি বলেন, যে কোনো চিন্তা যেহেতু ব্যক্তির অনুভূতিনির্ভর, সেহেতু বিমূর্ত চিন্তা বা সারধর্ম বা সামগ্রিক সত্তা অবশ্যই ব্যক্তিসত্তা বা বিশিষ্ট-সত্তার উপর তথা তাঁর অনুভূতি বা উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ব্যক্তিকসত্তা বা বিশিষ্টসত্তা (Existence) অবশ্যই সারধর্ম বা সামগ্রিকসত্তা বা সার্বিকসত্তার (Essence) পূর্বগামী। এ বক্তব্য অস্তিত্ববাদী চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। তাই কিয়ের্কেগার্দ অস্তিত্ববাদের উদ্ভাবক বা জনক বলে পরিচিত।

কিয়ের্কেগার্দের দর্শন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে রয়েছে এক ধরনের স্ববিরোধিতা। তিনি একদিকে যখন বলেন যে, যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে সমগ্র সত্তার মাঝে বিলীন করে দেয় তখন তিনি ব্যক্তিক স্বাধীনতায় সচেতন পুরুষ। কিন্তু তিনিই আবার ব্যক্তিসত্তাকে উৎসর্গ করেন এক পরম ও শাশ্বত সত্তার বেদী-মূলে। এখানে পরম সত্তার মাঝে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিলীন হবারই কথা। কিন্তু তিনি হয়তো সে কথা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'অস্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব সামগ্রিক সত্তার বা সারধর্মের পূর্বগামী' একথা বলে তিনি দর্শনের রাজ্যে এক নতুন চিন্তার সূত্রপাত করেন। আর তাঁর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে অস্তিত্ববাদ। এবং অস্তিত্ব, অস্তিত্ব বিষয়ক, আস্তিকতা প্রভৃতি শব্দের অস্তিত্ববাদী ব্যাখ্যা তিনিই প্রদান করেছেন।

সক্রেটিস বলেছিলেন 'নিজেকে জান'। কিয়ের্কেগার্দও নিজের অনুভূতিকে প্রাথমিক বলে গণ্য করতেন। অন্যদিকে দেকার্ত বলেছিলেন 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি অস্তিত্বশীল'। কিয়ের্কেগার্দ দেকার্তের বক্তব্যকে ঘুরিয়ে বলেন, 'আমি অস্তিত্ববান বলেই আমি চিন্তা করি'।

কারণ আমি প্রথমে অস্তিত্ববান হই, তার পরেই চিন্তা করি। অর্থাৎ চিন্তা নয়, আমার অস্তিত্বই প্রাথমিক ও মৌলিক। চিন্তা আমার অস্তিত্বের গুণমাত্র। অতএব চিন্তা বা অনুভূতি কখনো আমার অস্তিত্বের পূর্ব-গামী হতে পারে না; বরং অস্তিত্বই চিন্তার পূর্বগামী।

এভাবে কিয়ের্কেগার্দ অস্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব, তথা বিচ্ছিন্ন সত্তার অস্তিত্ব বিষয়ক যে বক্তব্য দেন উনবিংশ শতাব্দীতে, তাঁর মৃত্যুর পর সে মতবাদই অস্তিত্ববাদ নামে খ্যাতি লাভ করে। যদিও অস্তিত্ববাদ শব্দটিও তাঁরই সৃষ্ট। তবে আজকের দিনে তাঁর মতবাদকে বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত মতবাদ বলেই চিহ্নিত করা হয়।

ফ্রেডরিক নীটশে

অস্তিত্ববাদী চিন্তার আরেকজন প্রভাবশালী প্রবক্তা ফ্রেডরীক নীটশের (১৮৪৪-১৯০০) জন্ম জার্মানীর লাইপজিগের নিকটবর্তী রকেন নামক স্থানে। তাঁর পরিবার ধর্মের প্রতি শুধু অনুরাগীই ছিলো না, বরং ধর্মযাজক ছিলো। শৈশবে তাঁর পিতা মারা যান। মা এবং মাতুলা-লয়ের অন্যান্য আত্মীয়ের সহায়তায় তিনি লালিত-পালিত হতে থাকেন। এ পরিবেশে তিনি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করেন এবং সুযোগ-সুবিধাও লাভ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার পর তিনি বন ও লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে তাঁর পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি পরিবারের প্রচলিত প্রথা ও চিন্তাধারার বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত বর্জন করেন।

পারিবারিক চিন্তাধারা হতে বেরিয়ে এসে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম, ঈশ্বর, প্রচলিত নৈতিকতা—সব কিছু অস্বীকার করেন, আর বলেন: খ্রীষ্টান ধর্ম দাসত্ব-নৈতিকতাপ্রসূত, তাই জীবনের শত্রু; 'ঈশ্বর মৃত

এবং 'প্রচলিত নৈতিকতা দুর্বলদের নৈতিকতা, বা বীর্যবানদের কোণ-ঠাসা করতে প্রয়াসী, তাই তা-ও পরিত্যাজ্য'। সর্বোপরি তিনি বলেন যে, জগতের কোনো সঠিক উদ্দেশ্য নেই, ব্যক্তি মানুষ নিজেই নিজের লক্ষ্য স্থির করে। আর এ লক্ষ্য স্থির করে প্রত্যেকে নিজের স্বার্থে। সেক্ষেত্রে যে যত বেশি শক্তিশালী, সে তত সাফল্য লাভ করে, উদ্দেশ্য অর্জনে।

আমরা আগেই জেনেছি যে, সত্য বলতে কিয়ের্কেগার্দ শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা খ্রীষ্টান ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু নীটশে মনে করতেন যে, বিদ্যমান জগত সম্পর্কীত যে কোনো বর্ণনাই আমাদের মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল। কারণ জগতকে বর্ণনা দেয়ার জন্য আমরা যা প্রকাশ করি বা যে ধারণা ব্যক্ত করি, তা আমাদের উদ্দেশ্যের উপযোগী বলেই নির্বাচন করি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব ঘটনা বা বস্তুকে মূল্যায়ন করি, তা-ও আমাদের জন্য কোন্‌টা প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয়, কোন্‌টা মঙ্গলজনক বা কোন্‌টা অমঙ্গল-জনক, তার উপর ভিত্তি করেই করে থাকি। কারণ, প্রত্যেক মানুষই যে কাজ করুক না কেন, তার পেছনে থাকে প্রবল ইচ্ছাশক্তি। আর এ ইচ্ছাশক্তি হলো বিদ্যমান অবস্থাকে, জগতকে পরিবর্তন করার এবং শেষ পর্যন্ত জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ তথা প্রভুত্ব করার। সব প্রাণীই জগতে শুধু বেঁচে থেকে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, বরং তার মাঝে প্রবল ইচ্ছা শক্তি কাজ করে জগতে ক্ষমতা বিস্তার করার। যেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব আছে সেখানেই এ ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। কারণ, ক্ষমতার প্রতি অনুরাগই হলো মানবজাতির প্রকৃত স্বভাব বা প্রকৃতি।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসতে পারে, পৃথিবীতে সবাই যদি ক্ষমতা বিস্তারে প্রয়াসী হয়, তাহলে এ বিষয়ে কোনো সার্বিক নৈতিকতার

অস্তিত্ব আছে কি-না। এর উত্তরে নীটশে বলেন যে, চরম সত্য বলে যেমন কিছু নেই, তেমনি নৈতিকতার ক্ষেত্রেও কোনো কিছু চরমভাবে সত্য নয়, কোনো সার্বিক নৈতিকতা নেই। সত্যিকার অর্থে কোনো নৈতিকতাই নেই।

পূর্বেই বলেছি, নীটশের মতে নৈতিকতার কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ, নৈতিকতা আসলে কোনো সম্প্রদায় কিংবা কোনো জাতির স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। যারা কোনো রকম স্বার্থের কথা ভাবে, তারাই নৈতিকতার কথা বলে বা নৈতিকতাকে সংরক্ষণ করে। নীটশের মতে যদি কোনো নিয়ম প্রণয়ন করতে হয়, তাহলে তা নিজের জন্যই প্রণয়ন করতে হবে। আমি যদি কোনো কাজ করার জন্য বা সত্য কথা বলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই, তাহলে তা অবশ্যই আমার ইচ্ছা শক্তি দ্বারা সৃষ্ট এবং আমার, শুধু আমার জন্যই সৃষ্ট।

নৈতিকতাকে নীটশে দু'ভাগে ভাগ করেছেন দাসত্ব ও প্রভুত্ব নৈতিকতা রূপে। তাঁর মতে, যে নৈতিকতায় সহৃদয়তা ও সহানুভূতিকে উৎসাহিত করা হবে, তা আসলে সাহসিকতা ও বীরত্বকে নিরুৎসাহিত করে। এ নৈতিকতাই দাসত্বের নৈতিকতা। অন্যদিকে, প্রভুত্বের নৈতিকতার মাঝে কোনোরূপ সহানুভূতি বিদ্যমান নেই। সেক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হয় বীরত্ব, সাহসিকতা ও ক্ষমতাকে। মানুষ স্বেচ্ছায় এর যে কোনোটাকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। কিন্তু মানুষ যেহেতু স্বাধীন, সেহেতু সে সমাজে এর কোনোটাকে গ্রহণ না করে, নিজের প্রয়োজন মতো যে কোনো ধরনের নৈতিকতা তৈরিও করে নিতে পারে। তবে উল্লিখিত দু'ধরনের নৈতিকতার মাঝে নীটশের মতে প্রভুত্বের নৈতিকতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ মানুষ কখনো সমান নয়। তাই প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত

করতে চায়। যে বা যারা নিজেকে বা নিজেদের শ্রেষ্ঠ রূপে, প্রভু রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে, বাকি সবাই তার বা তাদের দাস হবে। নীটশের মতে সামাজিক সাম্য শুধু কল্পনাই নয়, অবাস্তবও। তাঁর মতে নারী-পুরুষের সমতাও অসম্ভব এবং নারী শুধু সন্তান উৎপাদনের উপায় মাত্র। বীররা যুদ্ধ করবে, মেয়েরা সেক্ষেত্রে মনোরঞ্জনের মাধ্যমে বীরত্বে উৎসাহিত করবে।

নীটশে মেয়েদের সম্পর্কে কোনো ভালো ধারণা পোষণ না-করলেও প্রবল যৌনাবেগের কারণে তিনি বিভিন্ন সময়ে বহু মহিলার প্রেম প্রত্যাশী হয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তার যৌনাবেগের প্রকাশ ঘটেছে অনেক ধরনের মেয়ের সাথে সাময়িক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। তার প্রবল যৌনাবেগ ও প্রেমে ব্যর্থতা এবং নানা ধরনের মেয়েদের সাথে মেলামেশার কারণে সৃষ্ট যৌনরোগ তাকে স্নায়বিক ও শারীরিক অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেয়, শেষ পর্যন্ত তাকে উন্মাদ করে তোলে। অনেকের মতে, মেয়েদের সম্পর্কে নীটশের প্রকাশিত মনোভাব তাঁর প্রেমে ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ।

নীটশে প্রচলিত কোনোরূপ নৈতিক আদর্শকে গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষকে চলতে হয় কোনো এক নীতি বা আদর্শের ভিত্তিতে। তাই প্রশ্ন দেখা দেয়, কোনো নৈতিকতা বা কোনো আদর্শই যদি গ্রহণীয় না-হয়, তাহলে মানুষ পথ চলবে কিসের ভিত্তিতে? এ প্রসঙ্গে নীটশের উত্তর হলো, সমাজে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি নিয়ম বা নীতি ঠিক করবেন, বাকিরা তাকেই অনুসরণ করবে। নীটশের মতে প্রকৃতিরাজ্যে তথা পৃথিবীতে প্রতিযোগিতায় যিনি এগিয়ে থাকেন, স্বাভাবিকভাবে তিনি শ্রেষ্ঠ। বাকি সবাই তাকেই অনুসরণ করবে। আর তা-ই স্বাভাবিক নিয়ম।

নীটশের মতে, ধর্মে তথা খ্রীষ্টান ধর্মে সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া ও উদারতার কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রকারান্তরে ধর্ম জনসাধারণ তথা অকর্মণ্য ও অনুগৃহীতদের প্রতি সমর্থন দিয়েছে। আর উপদেশ দিয়েছে, উৎকৃষ্টরা যেন নিকৃষ্টদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি নজর রাখে। এ প্রসঙ্গে নীটশে বলেন যে, আসলে ধর্ম তথা খ্রীষ্টান ধর্ম শ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠত্বকে বিরোধিতা করেছে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের শক্তি ও স্পৃহাকে নিরুৎসাহিত করেছে। তাই খ্রীষ্টান ধর্ম অবাস্তব ও অসম্ভব। আর ধর্মের ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ মানবের একাধিপত্যের বিরোধী। তাই নীটশে বলেছেন 'ঈশ্বর মৃত'। ঈশ্বর নেই, নীটশে এ কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন, 'ঈশ্বর এখন মৃত, তাকে হত্যা করা হয়েছে'।

উল্লেখ্য, নীটশে তাঁর দর্শনে মূলত কোনো সাধারণ নৈতিকতা স্বীকার না করার এবং শ্রেষ্ঠ মানবের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই সম্ভবত মানুষের জীবন থেকে ঈশ্বরকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ ঈশ্বর থাকলে তার নীতি সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। সে ক্ষেত্রে সামাজিক অসাম্য প্রচারের নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা কবলিত স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের তত্ত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধী নীটশে পারসী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যরথুস্ত্রের স্মরণাপন্ন হয়ে যরথুস্ত্রের 'ঈশ্বর মৃত' তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। যাতে মানুষ বিনা প্রশ্নে শ্রেষ্ঠ মানবকে মেনে নেয়, তিনি এ তত্ত্ব গ্রহণ করে আসলে সে পথই পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন।

ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকালে মানুষ যে কোনো শক্তিকে পূজা করতো এবং বীরদের দেবতার আসনে বসিয়ে তাদেরও পূজা করতো। তারপর আস্তে আস্তে মানুষের বুদ্ধি তথা কল্পনাশক্তি ও বিচারক্ষমতা বৃদ্ধির পরে সাকার ঈশ্বরের স্থান

দখল করেছে নিরাকার ব্রহ্ম। খ্রীষ্টান ধর্মেও নিরাকার ব্রহ্ম স্বীকৃত। কিন্তু নীটশে যখন দেখলেন যে, তার সমকালীন ইউরোপ ধর্মকে স্বীকার করে নানাবিধ অপরাধে লিপ্ত, সমাজ কুসংস্কারে পূর্ণ, তখন সে সমাজের সাথে নিজে একাত্ম হতে তো পারলেনই না, বরং বোধ করলেন এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা। আর তারই পরিণতিতে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের ঈশ্বরকে মৃত ঘোষণা করলেন পারসী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যরথুস্ত্রের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এবং এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের ঈশ্বরের বিপরীতে কল্পনা করলেন একজন বীরকে, মানুষরূপী ঈশ্বরকে যে বীর ঈশ্বর ধর্মীয় ঈশ্বরের মতোই শুধু হুকুম করবে এবং মানুষ বিনা প্রশ্নে শুধু তা পালন করবে।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নীটশে সাধারণ মানুষের উপর যে একাধিপতি বীরের কল্পনা করেছিলেন, সে বীর নীটশের কালে কেউ ছিলো কি-না, তা স্পষ্টভাবে না জানা গেলেও, একথা জানা যায় যে, তখন স্বৈরাচারী নেপোলিয়ান ইউরোপের অন্যান্য স্থানে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এবং নীটশেও নেপোলিয়ানের ভক্ত ছিলেন।

কার্ল ইয়েসপার্স

কার্ল ইয়েসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯) জার্মানীর ওলডেনবার্গে জন্মলাভ করেন। তিনি হেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি হেইডেলবার্গ ও মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের উপর অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে অন্তত পাঁচ বছর বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এমনকি মনোরোগ বিষয়ক একটি ক্লিনিকে বিজ্ঞান বিষয়ক সহকারী পদে কাজও করেন। মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য রোগী ও চিকিৎসকের মাঝে এক ধরনের মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর এরূপ

সম্পর্ক স্থাপিত হলে আমরা শুধু বিজ্ঞান ও বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে বিষয়ীনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারি। আর এ বিষয়ীনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতেই আমরা সত্যিকার সত্তার প্রকৃত স্তর সম্পর্কে জ্ঞাত হই, যে স্তর বিষয়নিষ্ঠভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না।

মানসিক রোগের চিকিৎসক থাকা কালেই ইয়েসপার্সের দর্শনের সমস্যাবলীর সমাধান সম্পর্কীত ধারণাবলী নির্ধারিত হয়। সত্তা সম্পর্কে তাঁর মূল কথা হলো: সত্তারূপী আমি এবং বস্তু এক নয়। আমার সত্তা এবং বস্তুসত্তা সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন। বস্তু আমার জ্ঞানের বিষয় হলেও, 'আমি' আমার জ্ঞানের বিষয় নয়। আর সে কারণেই আমি বলতে পারি যে, আমি আছি। এবং আমি যে আছি, তা আমি জানি আমার সংকল্প ও ইচ্ছার প্রেক্ষিতে আমারই সচেতন ক্রিয়ার মাধ্যমে, উপলব্ধির ভিত্তিতে। যদিও একথা সত্য যে, আমার সংকল্প ও ক্রিয়া স্বাধীন এবং তাদের ভিত্তি আমিই।

তিনি মনে করতেন, সত্তা নিজেকে তথাস্থ সত্তা, আত্মস্থ সত্তা ও স্বকীয় সত্তারূপে অভিব্যক্ত করে। সত্তার প্রতিভাত এ তিনরূপে প্রকৃতি ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে বিচারমূলক জ্ঞান লাভই সত্যি-কার দার্শনিকের লক্ষ্য। কারণ, সত্তার এ তিনরূপ সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই সত্যিকার ও প্রামাণিক সত্তার আবিষ্কার করা সম্ভব।

ইয়েসপার্স সত্তার প্রতিভাত তিন রূপকে স্বীকার করে বলেন যে, এর প্রথম রূপ অর্থাৎ তথাস্থ সত্তা হলো আমাদের অসন্দিগ্ধ অভি-জ্ঞতার বাস্তব জগত। এ জগতকে ভিত্তি করেই পরিচালিত হয় বিজ্ঞানের যাবতীয় গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাই, এ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগতকে একদিকে যেমনি অবাস্তব বলে অস্বীকার করা যায় না, অন্যদিকে এ প্রপঞ্চের জগতকে চরম বলে স্বীকার করে নেয়াও যায়

না। বরং প্রপঞ্চের জগতকে প্রতিভাত জগত রূপে স্বীকার করার পরও স্বীকার করে নিতে হয় অভিজ্ঞতার বাইরে এক ব্যাপকতর সত্তাকে, যার অস্তিত্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞানের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় না। তবুও মানুষ প্রতিনিয়ত সে সত্তাকে জানতে প্রয়াসী হয়।

অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সত্তা জানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিজ্ঞানের স্তর অতিক্রম করে প্রথমে জানবেন আত্মস্থ সত্তাকে। আর ঐ আত্মস্থ সত্তাকে জানার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কোনোরূপ গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজে আসে না। কারণ আত্মস্থ সত্তা কোনোভাবেই প্রতিভাসিক সত্তা নয়। তাই, তাকে জানতে হয় দর্শনের যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। কিন্তু আত্মস্থ সত্তাকে জেনেই দার্শনিক থেমে থাকবেন না, তাকে তার পরও অগ্রসর হতে হবে, সত্তার তৃতীয় ও শেষ রূপ, অর্থাৎ স্বকীয় সত্তাকে জানার জন্যে। এক্ষেত্রে দার্শনিক তার তথাস্থ সত্তা ও আত্মস্থ সত্তার স্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় সাধন করে প্রতীকের মাধ্যমে উপনীত হবেন স্বকীয় সত্তার স্তরে। আর এ স্তরই মানুষের সত্যিকার অস্তিত্বের স্তর।

লক্ষণীয় যে, ইয়েসপার্স তথাস্থ সত্তাকে অস্বীকার না করলেও খুব বেশি গুরুত্ব দেন নি। কারণ বিজ্ঞানের যাবতীয় গবেষণা হয়ে থাকে এ প্রতিভাসিক তথাস্থ সত্তার স্তরে। কিন্তু, এ স্তরে মানুষ বিচার বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধনে খুব বেশি ক্রিয়াশীল হতে পারে না বলেই আজ বিজ্ঞানের এ জয়যাত্রার কালেও মানুষ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে দারুণভাবে শঙ্কিত। সে কারণেই দর্শনের সাহায্যে মানুষের মাঝে জাগিয়ে তুলতে হবে আত্মস্থ সত্তা এবং সর্বোপরি স্বকীয় সত্তা সম্পর্কিত উপলব্ধি। এ উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ মানুষই হবে সত্যিকার মানুষ, স্বকীয়তাপূর্ণ মানুষ।

ইয়েসপার্স স্বকীয় সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে আসলে বিজ্ঞানের তুলনায় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকার করেছেন। তার দর্শনকে সঠিক-ভাবে অনুধাবন করার জন্য তার আত্মা, প্রান্তিক পরিস্থিতি, সামগ্রিক চেতনা প্রভৃতি সম্পর্কিত বক্তব্যও অনুধাবন করা প্রয়োজন। তিনি আত্মার প্রকৃতিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, এবং বলেছেন, আত্মার দু'টি ধাপ। আর তা হলো অপ্রকৃত ও প্রকৃত। তার মতে যে আত্মা শুধু দেহের কাঠামোর মাঝেই বিরাজ করে, গড্ডালিকা প্রবাহে প্রবাহিত হয়, সে আত্মা প্রকৃত আত্মা নয়; তুলনামূলকভাবে অসত্য বা অপ্রকৃত আত্মা। আর যে আত্মা স্বাধীন সংকল্প গ্রহণ করে, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, কোনোরূপ গড্ডালিকা প্রবাহের সাথে তাল মিলিয়ে চলে না, সে আত্মাই প্রকৃত আত্মা বা সত্যিকার আত্মা।

ইয়েসপার্সের মতে, ব্যক্তি 'প্রান্তিক পরিস্থিতি'র মাঝেই তার অস্তিত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে। এ ধরনের প্রান্তিক পরিস্থিতির সময়েই ব্যক্তির কাছে যন্ত্রণা, অসুস্থতা, পাপবোধ ও মৃত্যুর অস্তিত্বের তাৎপর্য উন্মোচিত হয়। এ সময়েই ব্যক্তি মুখোমুখি হয় মূল অস্তিত্বের। আর মূল অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়েই সে গভীরভাবে উপলব্ধি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

ইয়েসপার্সের মতে চেতনা বিষয়গত নয়, বিষয়ীগতও নয়; বরং উভয়ের সমন্বিত রূপ। এ চেতনার স্বরূপ একমাত্র দর্শনই উদ্ঘাটন করতে পারে। তাই দর্শনের কাজ হলো চেতনার স্বরূপ উদ্ধার করা। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, এ চেতনার প্রকৃতি উদ্ধারের ক্ষেত্রে জ্ঞানের আকার ও প্রকার প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তিনি ব্যাপক অর্থে একে 'বিষয়হীন জ্ঞান' ও 'দার্শনিক বিশ্বাস' বলে অভিহিত করে-ছেন। এবং বলেছেন, এ বিশ্বাসই হলো অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ। যার প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে জ্ঞাতার ইচ্ছা ও বস্তুর মাধ্যমে। আর

এ দার্শনিক বিশ্বাস কখনোই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-নির্ভর নয়, বরং ব্যক্তির দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নির্ভর।

ইয়েসপার্স বলেন যে, বিজ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানুষের অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞানের কলাকৌশল যেভাবে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পাশাপাশি ধ্বংসের মুখোমুখি করছে, তা অবশ্যই যে কোনো সচেতন মানুষের কাছে উদ্বেগের কারণ। আর, এ-রকম অবস্থাই মানুষকে করে তোলে নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে সন্দিহান। ফলে মানবিক পরিস্থিতিতে দেখা দেয় সঙ্কট, মানুষ অস্তিত্বের প্রশ্নে বোধ করে নিরাপত্তাহীনতা। আর এর ফলে সমাজ কবলিত হয় মারাত্মক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকৃতির মাঝে। ইয়েসপার্স বলেন, মানুষের এ-অবস্থার জন্য মানুষই দায়ী। কারণ, মানুষ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু মানবিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হয় নি। সচেতন হলে এ ধরনের উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

তিনি আরো বলেন, এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে, মানুষের অস্তিত্বের বিকাশের প্রশ্নকে সন্দেহমুক্ত করতে হবে, মানুষকে তার বাস্তব রূপের ভিত্তিতে চিত্রিত করতে হবে। তার মাঝে যে অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান আছে, তাকে বিকশিত করেই ব্যক্তির অস্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির একথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, মানুষ পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন এবং অফুরন্ত সম্ভাবনার অধিকারী। তাকে এ সম্ভাবনার রাজ্য হতে অস্তিত্বের স্তরে উপনীত হতে হবে। কারণ, অন্য প্রাণী বা বস্তুর বিদ্যমান থাকা, এবং মানুষের অস্তিত্বশীল হওয়া এক কথা নয়। প্রাণী বা বস্তু শুধু বিদ্যমান থাকে। তার মাঝে বিকাশের চেতনা অনুপস্থিত। কিন্তু মানুষ সচেতন প্রাণী। সে যেদিন থেকে মানুষ হয়েছে, সেদিন থেকেই সচেতনতার কারণে অন্য প্রাণীর তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

সে তার নিজের ও পারিপার্শিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং সব সময়ই উপস্থিত অবস্থাকে পরিবর্তিত করতে প্রয়াসী। আর, এ সচেতন প্রয়াসের কারণেই মানুষ, শুধুমাত্র মানুষই অস্তিত্বশীল। সে যদি নিজের অস্তিত্বশীলতা সম্পর্কে সচেতন না হয়, এবং অন্যের মুখাপেক্ষী হয় তাহলে সে অবস্থায় অবশ্যই তাকে আর অস্তিত্বশীল বলা যাবে না। বলতে হবে সেও বিদ্যমান। অস্তিত্ববাদীদের মতে অস্তিত্বশীলতার সাথে সচেতন কর্মের সম্পর্ক অতি গভীর। তাই, প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব হলো বিদ্যমান অবস্থাকে পরিবর্তন করে ব্যক্তিত্বের তথা স্বতন্ত্র ব্যক্তির সার্থক রূপদান করে এবং পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে নিজ অস্তিত্বকে দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করা।

ইয়েসপার্স ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁর মতে, ঈশ্বর সর্বময় চেতনা, যা জগতের বাইরে ও ভিতরে আছে। কিন্তু ঈশ্বরকে জানা যায় না, প্রমাণও করা যায় না। তা সত্ত্বেও তিনি যে আছেন, তা স্বীকার করে নিতে হয়।

ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলেও ইয়েসপার্সের দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ। তিনি সর্বদা চিন্তা করেছেন মানব পরিস্থিতির বিষয়ে। আর 'আধুনিক মানব' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, মানুষ স্বাধীন ও অপরিসীম শক্তির অধিকারী। সে এ স্বাধীনতা ও শক্তিকে ব্যবহার করেই নিজ অস্তিত্ব প্রমাণ করতে এবং তার প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে।

গ্যাব্রিয়েল মার্সেল

মার্সেলের (১৮৮৯-১৯৭৩) জন্ম ফরাসী দেশে। ছোটবেলা তাঁর মা মারা যায় এবং তিনি তার এক নিকট আত্মীয়ার কাছে লালিত-পালিত হন। ছোটবেলা হতে মায়ের অনুপস্থিতি তাকে দারুণভাবে

হতাশ করে এবং তিনি বিচ্ছিন্নতা ও হতাশায় গভীরভাবে আক্রান্ত হন। এ অবস্থায় তিনি হতাশা ও উদ্বেগের মাঝে শেষ পর্যন্ত ৪০ বছর বয়সে রোমান ক্যাথলিক চার্চে গিয়ে ধর্মীয় দীক্ষা লাভ করেন এবং (তাঁর মতে) হাতাশা মুক্ত হন।

মার্সেল ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনার মধ্যে সাধারণ ভাববাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ভাববাদের প্রভাব বলয় হতে বেরিয়ে আসেন। ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করার কারণে দর্শনের ইতিহাসে তিনি অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। তবে একথা সত্য যে, ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী মার্সেল ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নে অধিক সচেতন থাকলেও, ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান নি। তিনি এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত এক অতিবর্তী ঈশ্বরেই বিশ্বাসী ছিলেন।

মার্সেল লক্ষ্য করেন যে, তার পূর্ববর্তী দার্শনিকরা বিষয় ও বিষয়ী, চিন্তা ও সত্তা, দেহ ও আত্মা, আমি ও তুমি, ব্যক্তি ও ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেসব বক্তব্য রেখেছেন, তা যথার্থ নয়। আর সে সবে বিশ্বাস অস্তিত্ববাদী চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়। তাই তিনি তার অস্তিত্ববাদী চিন্তাকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে এ সব চিন্তার দ্বৈততা পরিহার করতে প্রয়াসী হন।

প্রথমেই তিনি বিষয় ও বিষয়ী সম্পর্কিত প্রচলিত দ্বৈততা পরিহার করতে চেষ্টা করেন। এবং এক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন যে, বিষয় ও বিষয়ীর মাঝে বিদ্যমান দ্বৈততা আসলে দেহ ও মনের মধ্যে বিদ্যমান দ্বৈততার সমস্যার সাথে সম্পৃক্তই শুধু নয়, বরং নির্ভরশীল। তাঁর মতে বিষয়ী অর্থাৎ সত্তার অস্তিত্ব ঘোষণাকারী এবং ঘোষিত

সত্তার মাঝে কোনোরূপ দ্বৈত সম্পর্ক নেই। একথার পরে তিনি বলেন যে, দেকার্ত সহ অনেক দার্শনিক দেহ ও মনের মাঝে যে দ্বৈত সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন, তা আসলে ঠিক নয়। কারণ দেকার্ত আত্মাকে দেহাতিরিক্ত সত্তা রূপে স্বীকার করে বলেছেন যে, দেহ হলো আত্মার আধার। কিন্তু আসলে তাদের যা বলা উচিত ছিলো তা হলো, আমিই আমার দেহ অর্থাৎ আমি এবং আমার দেহ অভিন্ন সত্তা। আর 'জগতে আমি আমার দেহের মধ্যেমেই অংশ গ্রহণ করি।' মার্সেল মনে করেন যে, এক্ষেত্রে যদি আমি ও আমার দেহ একাত্ম হয়ে যায়, এ কথার মাঝে ভুল বুঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই। কারণ, আমার দেহ তো কোনো যন্ত্র নয়, যা আমার জ্ঞানের বিষয় হবে। বরং 'আমি' বলতে বুঝায় দেহ ও মনের একাত্মতা। তাই, দেহকে কোনো ভাবেই আমার চিন্তার বিষয় করা যায় না। তবে একথাও ঠিক নয় যে, দেহ বিষয় না-হলে বিষয়ী হবে। আসল কথা হলো আমি আমার দেহে মূর্ত হয়ে আছি, এবং এ মূর্ত আকার ধারণের মাধ্যমেই আমার আমিত্বের তথা অস্তিত্বের প্রকাশ।

মার্সেল মনে করেন, বিষয় ও বিষয়ীর মতোই আমি ও তুমি অর্থাৎ অন্য সত্তার সম্পর্ক বিদ্যমান। অবশ্য একথা বিশ্বাসের। আর এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মার্সেল স্বীকার করেন সব বাহ্য সত্তার অস্তিত্ব। এভাবে অগ্রসর হবার মাধ্যমে মার্সেল বলেন যে, আমরা যেভাবে বিশ্বাসের ভিত্তিতে বাহ্য বস্তু বা অন্য সত্তাতে বিশ্বাস করি, তেমনি-ভাবে উচচতম বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি চরম অতিবর্তী সত্তাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে। আর এ সবের কোনোটির অস্তিত্বই যুক্তিতে প্রমাণ করা যায় না; বরং এ সবের সাথে যদি আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে, তাহলে কিংবা কোনোরূপ সম্মিলিত কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই এ সবের অস্তিত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ লাভ করে।

মার্সেল স্বাভাবিকভাবেই অস্তিত্বকে অধিক মূল্য দেয়ার কারণে অস্তিত্ব ও বিদ্যমানতার মধ্যে গভীর পার্থক্য স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, বস্তু ও প্রাণীর বিদ্যমানতা (**having**) এবং সচেতন মানুষের অস্তিত্ব (existence) এক কথা নয়। কারণ, মানুষের ধর্ম হলো সচেতন কর্মে প্রয়াসের মাধ্যমে বিদ্যমানতার স্তর অতিক্রম করে, স্ব-আমিত্বের ভার হতে মুক্ত হয়ে, স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং স্বাধীনভাবে নিজের স্বরূপ নির্ধারণ করা। অবশ্য এ সম্পর্কে গভীরভাবে ধর্মে বিশ্বাসী মার্সেল শেষ পর্যন্ত বলেন যে, **মানুষ** মৃত্যুকালে সব ধরনের বিদ্যমানতার স্তর অতিক্রম করে, অনন্ত জীবনে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়। আর তা-ই মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য। কারণ মৃত্যু কোনোরূপ শূন্যতা নয়, বরং অনন্ত জীবনে প্রবেশের মাধ্যম মাত্র।

পূর্বে আলোচিত অস্তিত্ববাদী চিন্তাবিদ্‌দের মতো মার্সেলও বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে মানুষের অস্তিত্ব ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে বলে বিশ্বাস করতেন। সে ক্ষেত্রে তিনি কোনো রূপ সদর্থক পথ খুঁজে না-পেয়ে দারুণভাবে হতাশার সাগরে নিপতিত হন। এবং এক পর্যায়ে তিনি হতাশার কারণে আত্মহত্যার মাঝেই জীবনের যথার্থতা খুঁজে পান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তিনি আসলে ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে দ্বৈত অবস্থাকে দূর করে একত্বের দর্শনই প্রচার করেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি আবার যখন ব্যক্তি সত্তার সাথে অন্যান্য সত্তার একাত্মতার কথা বলেন, তখন তা-ও শেষ পর্যন্ত তার ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যায়। এসব দিক বিবেচনা করে অনেকে তাকে ক্যাথলিক অস্তিত্ববাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এ ধরনের আরোপণের বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে, সত্তার অস্তিত্ববাদী অংশ গ্রহণ যে কোনো ধর্মীয় নির্দেশের **পূর্ববর্তী** বলে স্বীকার করার কারণে তার মতবাদ সত্যিকার অর্থেই অস্তিত্ববাদী।

মার্টিন হাইডেগার

মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯ ১৯৭৬) জার্মানীর এক ক্যাথলিক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যুবকাল হতেই তিনি পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে আগ্রহী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রভাষক থাকা অবস্থায় তিনি হুসার্লের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন। হুসার্লের পরে তিনি অধ্যাপক রূপে দায়িত্বপালন করেন। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর তিনি রেক্টর নির্বাচিত হন। এ সময়ে তিনি নাজী দলে যোগদান করেন এবং হিটলারের অনুরাগী রূপে অনেক দায়িত্ব পালন করেন। তবে, কিছুদিন পর সম্ভবত নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার কারণে তিনি পদত্যাগ করেন এবং নির্জনবাস শুরু করেন। প্রখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগার, যার কাছ থেকেই আমরা প্রথম শুনি 'অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্বগামী,' তিনি কিন্তু নিজেকে অস্তিত্ববাদী বলে স্বীকার করতেন না। এবং তার আলোচনার মূল বিষয়ও অস্তিত্ব বিষয়ক নয়, সত্তা বিষয়ক।

তার মতে আমাদের কোনো কিছু জানার ক্ষেত্রে প্রথমে জানতে হবে সত্তাকে। আর তার এ সত্তার অর্থ অবশ্য অস্তিত্ব, যদিও সামগ্রিক বা সার্বিক অস্তিত্ব। তবে তার আলোচনার যে কেন্দ্র বিন্দু সত্তা, তার কারণ অবশ্য অস্তিত্ব বিষয়ক আলোচনার প্রয়োজনেই। আর সে কারণেই তিনি দাবী করুন বা না-ই করুন, অস্তিত্ববাদী দর্শনে তার রয়েছে এক বিশেষ স্থান।

তার মতে সত্তাকে জানাই আসল কথা। তবে, এ সত্তাকে জানার ক্ষেত্রে মানুষের অস্তিত্ব হলো শুধু প্রাথমিক সূত্র। আর এক্ষেত্রে তিনি অস্তিত্বের প্রকৃতি জেনেই থেমে থাকতে চান নি, বরং অস্তিত্বের অর্থ, উদ্দেশ্য তা-ও জানতে প্রয়াসী হয়েছেন। এবং যাত্রা শুরু করতে চেয়েছেন অস্তিত্বের অর্থ নিয়ে। তবে এ অস্তিত্ব তো তার কাছে

সামগ্রিক অর্থে। আর সে কারণেই তার মতে মানুষের অস্তিত্ব সার্বিক অস্তিত্বের অংশ মাত্র। তবে এ অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ সামগ্রিক অস্তিত্বের অংশ এ মানুষই একমাত্র নিজের অস্তিত্ব, বস্তুর ও সর্বোপরি জগতের বৈচিত্র্য অনুধাবন করতে পারে, তাদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে।

তিনি মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মানুষের অস্তিত্বশীল হবার অর্থ হলো বিশ্বের মাঝে অস্তিত্বশীল হওয়া, সামগ্রিক সত্তার মাঝে অস্তিত্বশীল হওয়া। কারণ, 'আমি অস্তিত্বশীল,' এ কথা বলার অর্থ হলো আমি 'আমি বিশ্বের মাঝে অস্তিত্বশীল'। তবে জগতের মাঝে অন্যান্য প্রাণী বা বস্তুর অবস্থান করা আর মানুষের অস্তিত্ব এক কথা নয়। কারণ, মানুষ অস্তিত্বশীল হয় তার সমগ্র সচেতনতা নিয়ে। আর সচেতনতা থাকলে পারি-পার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তার অবশ্যই উদ্বেগ থাকবে। আর, মানুষের অস্তিত্বশীলতার ক্ষেত্রে উদ্বেগই আসল কথা। এবং এর ভিত্তিতে মানুষের অস্তিত্বকে বোধগম্য করতে চেষ্টা করতে হবে, বিবিধ দ্রব্য বা প্রাণীর অবস্থিতির প্রেক্ষিতে। তবে, তিনি আরো বলেন যে, মানুষ জগতে অস্তিত্ববান হলেও, মানুষের অস্তিত্বের সাথে কোনো সম্পর্ক ছাড়া বিশ্ব কোনোভাবেই অর্থবহ হতে পারে না। যদিও, মানুষ বিশ্বের মাঝেই অস্তিত্বশীল। কারণ, বিশ্বে মানুষই একমাত্র সচেতন-ভাবে তথা উদ্বেগের সাথে অস্তিত্বশীল।

হাইডেগার মানুষের অস্তিত্ব বলতে সামগ্রিক মানুষের অস্তিত্ব বুঝালেও, তিনি কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা একেবারে বাদ দেন নি। তাই তিনি বলেছেন যে মানুষের মাঝে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার স্বাতন্ত্র্য; যে স্বাতন্ত্র্যের কারণে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে। আর এ স্বাতন্ত্র্য হলো প্রত্যেক বিশিষ্ট মানুষের বিশিষ্ট গুণাবলী, প্রচ্ছন্ন ব্যক্তি

ও সম্ভাবনা। আর এর ভিত্তিতেই প্রত্যেকের রয়েছে স্বকীয়তা, আবার সীমাবদ্ধতা। স্বকীয়তা এখানেই যে, প্রত্যেকেই নির্বাচন করে, এবং নির্বাচন করে বলেই উদ্বিগ্ন হয়। অন্যদিকে, সীমাবদ্ধতা হলো, এ সবের ভিত্তিতে মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্বই হলো তার সারধর্ম। এ সারধর্ম ফলপ্রসূ হয় তার সম্ভাবনার বাস্তব রূপ লাভেরই মাঝে।

মানুষের অস্তিত্ব মানে যেহেতু এ বিশ্বের মাঝে অস্তিত্ব, সেহেতু তার যেকোনো নির্বাচন এ বিশ্বের মাঝেই তাকে করতে হয়। তবে এ নির্বাচন কখনো কখনো যথার্থ হয় না, কারণ অনেক সময়ই আমরা এ নির্বাচনে সাধারণ মানুষের একজন হয়ে অংশ গ্রহণ করি। কিন্তু হাইডেগারের মতে ব্যক্তি যদি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে, সাধারণের একজন হিসেবে কোনো কিছু নির্বাচন করে তবে সে নির্বাচন হলো অযথার্থ নির্বাচন। এরূপ নির্বাচনের মাঝে মানুষের যে অস্তিত্ব বিদ্যমান, তা-ও অযথার্থ অস্তিত্ব।

মানুষ যদি সাধারণ মানুষ থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে কোনো কিছু নির্বাচন করতে পারে, স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে উদ্বিগ্ন হতে পারে, তাহলেই তার নির্বাচন হবে যথার্থ। আর, এধরনের স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে মানুষ যদি নিজের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করতে পারে, এককভাবে নির্বাচনের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে, তাহলেই তার যথার্থ অস্তিত্বের শুরু হবে, অস্তিত্বও যথার্থ হবে।

কারণ, মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, জনসাধারণ তার জীবনের ক্ষেত্রে কখনো গুরুত্ব বয়ে আনতে পারে না, সে একা এবং একক-ভাবে তাকেই যে কোনো কিছু নির্বাচন করতে হবে, যে কোনো বিষয় তার ইচ্ছার উপর মূল্যবান বা অমূল্যবান হবে, তখন সে এককভাবে উদ্বিগ্ন হয়, এবং যথার্থ অস্তিত্বে ফিরে আসে। এ অবস্থায় তার আত্মোপলব্ধি ঘটে এবং তার মনে জাগে মনস্তাপ। এ অবস্থায়ই

মানুষ এককভাবে নিজের উদ্বেগের বিষয় স্থির করতে পারে, আর একাকীত্ববোধ থেকে দৃঢ়তার সাথে যথার্থ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে।

হাইডেগারের মতে ব্যক্তি-মানুষের যথার্থ অস্তিত্বের স্তরের উদ্বেগের মূলে রয়েছে তার এক ধরনের অনস্তিত্বের ধারণা। কারণ, এ অস্তিত্ব-শীল অবস্থার কোনো স্থায়ী রূপ নেই। আজ যা অস্তিত্বশীল, একদিন তা-ই অনস্তিত্বশীল হবে, সব কিছু একদিন ধ্বংস হবে, ব্যক্তির একদিন মৃত্যু হবে। আর সে অবস্থাই হলো ব্যক্তির অনস্তিত্বশীল অবস্থা। এ অবস্থায় মনস্তাপ জাগার প্রধান কারণ হলো, মৃত্যু একান্তই ব্যক্তিগত, কেউ কারো জন্যে মৃত্যু বরণ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে হাইডেগার বলেন যে, মানুষের অনস্তিত্বের স্তর আসলে অস্তিত্বের স্তরেরই প্রাথমিক অবস্থা।

উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে তিনি বলেন যে, অনস্তিত্বের উপ-লব্ধি হলেই আমরা কিছু করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি, কিছু করতে চাই। আর কিছু করতে চাওয়া বলতে বর্তমানে কিছু করছি বুঝায় না, বরং বুঝায় 'ভবিষ্যতে কিছু করবো'। সে বিচারে তাঁর দর্শনে সময়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তার মতে সময়কে তিন ভাগে ভাগ করা চলে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। আর অযথার্থ অস্তিত্বের মানুষ শুধু বর্তমান নিয়ে ভাবে, বর্তমানকে মোহনীয়-আকর্ষণীয় বা ভোগীয় করে তুলতে চায়। অতীত সম্পর্কেও তার কোনো মনস্তাপ নেই, ভবিষ্যত সম্পর্কে তার কোনো উদ্বেগ নেই। কিন্তু যথার্থ অস্তিত্বশীল ব্যক্তির কাছে ভবিষ্যত আসলে নিকট বর্তমান। যা খুব শীঘ্রই তার কাছে উপস্থিত হবে, শীঘ্রই তাকে মৃত্যুর মাধ্যমে অনস্তিত্বের স্তরে পৌঁছতে হবে। এ চেতনাবোধের কারণেই মানুষ সময় সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সমন্বয় সাধন করে, বর্তমান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তার কাছে তখন বর্তমান প্রতিভাত হয় অতীত ও ভবিষ্যতের

সমন্বয় রূপে। একজন যথার্থ অস্তিত্ববাদীর কাছে তখন মনে হয়, 'অতীত হলো যা এখানে অনুপস্থিত, অনস্তিত্বশীল', বর্তমান হলো 'যা এখানে এখনো বিদ্যমান, তবে অনস্তিত্বশীলতার দিকে ধাবমান' এবং ভবিষ্যত হলো 'যা এখনো ঘটে নি, তবে শীঘ্রই বর্তমান রূপে উপস্থিত হবে'। এমনি অবস্থায় যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষ অবশ্যই উপলব্ধি করে যে, সে অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যস্থলেই অবস্থান করছে।

যথার্থ অস্তিত্বের স্তরে মানুষ সর্বদাই সতর্ক থাকে যে, তার অস্তিত্বের স্তর শীঘ্রই বর্তমানরূপে তার কাছে ধরা দেবে। তাই এ ক্ষেত্রে মানুষের অস্তিত্বের অর্থ হলো সম্ভাবনার ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্র থেকে মানুষ প্রতি-নিয়ত উদ্বেগ তাড়িত হয়ে নির্বাচন করে, নতুন নতুন নির্বাচনের দিকে, এক সম্ভাবনার স্তর থেকে আরেক সম্ভাবনার স্তরের দিকে ছুটে চলে, এক স্তর অতিক্রম করে অন্য স্তর অতিক্রমে প্রয়াসী হয়, যতক্ষণ না তার অনস্তিত্বের ফলে মৃত্যু এসে বর্তমান রূপে উপস্থিত হয়। আর মৃত্যুই হলো অস্তিত্বের স্তর। এখানে সব সম্ভাবনা হয় সমাপ্ত।

আমরা আগেই বলেছি, মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা মানুষকে অস্তিত্ব সচেতন করে তোলে। কারণ, মৃত্যু চিন্তা প্রত্যেক অস্তিত্বশীল সত্তাকে সম্মুখীন করে অনস্তিত্বের। আর এ অনস্তিত্ব অস্তিত্বের অনুপস্থিতি হলেও বাস্তব। তাই, হাইডেগার বলেন যে, অস্তিত্ব আসলে অনস্তিত্বেরই নিমিত্তে।

কিন্তু এ 'অনস্তিত্বের নিমিত্ত অস্তিত্ব'-এর ক্ষেত্রে মানুষই শুধু সচেতন। আর সে সচেতন বলেই. সে অনস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েও হতাশার মাঝে নিমজ্জিত হয় না। বরং স্বাধীনভাবে ভবিষ্যত সম্পর্কে পরিকল্পনা করে। তাছাড়া ব্যক্তি সত্তা তথা অস্তিত্ব যেহেতু সারধর্ম তথা সার্বিক সত্তার পূর্বগামী, সেহেতু মানুষের কোনো পূর্বকল্পিত প্রকৃতি

নেই। আর, পূর্ব প্রদত্ত প্রকৃতি না থাকার কারণেই মানুষ স্বাধীনভাবে এবং সচেতনতার সাথে নিজের প্রকৃতি তৈরি করে। স্বাধীনতার বীজ যেহেতু তার মাঝে রয়েছে সেহেতু সে স্বাধীন। আর, এই স্বাধীনতাবোধই সত্যিকার অর্থে অস্তিত্ববোধ।

লক্ষণীয় যে, হাইডেগার ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আর, ঐ স্বাধীনতার অর্থ হলো, মানুষ যেহেতু গতিশীল, সেহেতু সম্ভাবনার মাঝে তার বিকাশ এবং অবস্থান্তরই তার ধর্ম। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রশ্নে সে অবশ্যই স্বাধীন। তবে একথা ভাবার কারণ নেই যে, এ স্বাধীনতা একেবারে অবাধ। মানুষের জন্মগত স্থান, কাল, জাতি, গোত্র, বর্ণ প্রভৃতির, এমনকি ব্যক্তি মেয়ে হবে না পুরুষ হবে, সেসবের ক্ষেত্রে তার কোনোরূপ হাতও নেই, আবার নির্বাচনের স্বাধীনতাও নেই। এসব অবশ্যই তার আওতার বাইরে। এগুলো হাইডোগারের মতে ভাগ্য। আর, এসব বিচার করে তিনি বলেছেন যে, মানুষ স্বাধীন হলেও তার স্বাধীনতা ভাগ্য দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত।

স্বাধীনতা একদিকে মুক্ত, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। এ অবস্থাকে হাইডেগার সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। আর, তাঁর এ সমন্বয়ী-স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে যে নৈতিক মত গড়ে উঠেছে, তাও মানব সমাজ ও সভ্যতার গতিশীলতার ভিত্তিতে সৃষ্ট মননের ফসল বলে, অবশ্যই বাস্তব ভিত্তিক তথা সময়োপযোগী নৈতিক মতাদর্শ। এরূপ মতাদর্শে কোনোরূপ স্থবিরতা, সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধতা স্থান পায় না বলে, একে বলা হয় সৃজনশীল নৈতিকতা।

হাইডেগার অনস্তিত্বের কথা, মনস্তাপের কথা, উদ্বেগের কথা বলেছেন, স্বাধীনতার সীমিতাবস্থা স্বীকার করেছেন, এবং সেগুলোর বাস্তব ভিত্তির কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, এ সীমাবদ্ধ অবস্থা তৈরির জন্য অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। সে কারণে তিনি

সৃজনশীল নৈতিকতার ক্ষেত্রেও এরূপ কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ভূমিকা স্বীকার করেন নি।

জ্যঁা-পল সার্ত

প্রাথমিক পরিচয় : অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যকার বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং নানাবিধ অসঙ্গতি ও ভুল বোঝাবুঝির নিরসনে সার্ত সর্বাধিক প্রয়াস নেয়ার কারণে, 'অস্তিত্ববাদ' ও 'সার্ত' আজ প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। তিনি শুধু পেশাদার দার্শনিক হিসেবেই নন, বরং অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, নাটকসহ সাহিত্যের বিবিধ ধরনকে ব্যবহার করে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারাকে একদিকে প্রচার করেছেন, এবং অন্যদিকে বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই বলা যায়, সাম্প্রতিককালে অস্তিত্ববাদ যতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, তার পেছনে যাঁর অবদান সর্বাধিক, তিনি হলেন ফরাসী দার্শনিক জ্যঁা-পল সার্ত (১৯০৫-৮০)।

সার্ত প্রয়াত হলেন ১৯৮০ সালের ১৫ এপ্রিল মধ্যরাতে। সে বছরের ২০ মার্চ তাকে ভর্তি করা হয় প্যারিসের ব্রুজেঁ হাসপাতালে। অবশ্যই তখন কেউ ভাবতে পারে নি যে, তিনি জীবিতাবস্থায় আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু তাঁর হাসপাতালে ভর্তির ২৫ দিন পর ঘটলো সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি। গভীর রাতে প্যারিসের পত্রিকা অফিস-গুলোতে যখন সার্তের প্রয়াণের খবর পৌঁছে. তখন বেশির ভাগ দৈনিকেরই প্রথম ও শেষ পাতার ছাপা চলছিলো। কিন্তু, 'ফরাসী দেশের বিবেক' বলে কথিত এ মহান দার্শনিকের প্রয়াণের সংবাদ পেয়ে, সব পত্রিকা কর্তৃপক্ষই ক্ষণিকের জন্য ছাপার কাজ স্থগিত রাখলো। তার পর এ-সংবাদের ভিত্তিতে মোটা ও কালো হেডলাইনে ছাপলেন প্রতিটি দৈনিকের প্রথম পাতা। ফলে, পরের দিন প্যারিসের প্রতিটি দৈনিকই বিলম্বে প্রকাশিত হয়েছিলো।

সার্তের জন্ম ১৯০৫ সালের ২১ জুন, প্যারিসেই। তার পিতা ছিলেন নৌবাহিনীর একজন অফিসার, যিনি ১৯০৫ সালেই মারা যান। কিন্তু বেশ কয়েক বছর পর সার্তের মা এ্যান-মারি শোয়াইটজার দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন ১৯১৬ সালে। যদিও সার্তের জীবনের প্রথম দশ বছর কাটে পিতামহ মোশিয়ে শার্ল শোয়াইটজারের তত্ত্বাবধানে। বলা চলে এ অবস্থায় সার্ত 'স্বাধীনভাবেই' বেড়ে উঠেছিলেন। আর সম্ভবত এ কারণেই ব্যক্তি জীবনের প্রথম ধাপের প্রায় নিঃসঙ্গতার প্রভাবের ফলশ্রুতিতে তাঁর মানসে প্রায় আজীবন লালিত হয়েছে 'নিঃসঙ্গ স্বাধীনতা'। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর দর্শনেও লক্ষ্য করা যায়।

শৈশবে তিনি তাঁর মাতামহের বিশাল গ্রন্থাগারের প্রায় সব পুস্তকই পড়েছিলেন। এর পর শিক্ষাজীবনে ১৯২৫ সালে তিনি ভর্তি হন 'ফরাসী বুদ্ধিজীবিদের সূতিকাগার' বলে কথিত 'ইকোলে নরম্যাল সুপেরিয়ার'এ। পরীক্ষায় প্রথম বার অকৃতকার্য হলেও, দ্বিতীয় বারে (১৯২৯) তিনি কৃতিত্বের সাথে কৃতকার্য হলেন। সে সময়ে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত মার্কসীয় চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক পল নিজান, সিমন দ্য ব্যুভেয়র, মরিস মার্লোপন্টি, রেমণ্ড এ্যারোন প্রমুখ। তার পর থেকে ব্যুভেয়রের সাথে অলিখিত চুক্তির ভিত্তিতে, সামাজিক বিয়ে না করেই একত্রে বসবাস করেন আমৃত্যু। প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি তাদের ছিলো প্রবল অনীহা। অন্যদিকে সন্তান লাভের প্রতিও তাদের কোনো আগ্রহ ছিলো না। তাছাড়া তারা এও মনে করতেন যে, সামাজিক বিয়ে মানুষের স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করে, নৈতিকতাকে দুর্বল করে। আর এ সবই ছিলো তাদের বিয়ে না করার প্রধান কারণ। তবে. শেষ জীবনে তাঁরা সম্ভবত সন্তান প্রত্যাশী হয়েছিলেন, আর সেজন্যই আর্লেত এল কাইমকে গ্রহণ করেছিলেন পালিতা কন্যা হিসেবে।

সার্ত জীবনের প্রথম দিকে কয়েক মাস চাকুরী করেন সেনাবাহিনীর আবহাওয়া বিভাগে। এর পর প্রায় দু'বছর লা-হারভ-এ শিক্ষকতা করেন, এবং পরবর্তী এক বছর অধ্যাপনা করেন বার্লিনের একটি ফরাসী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। জার্মান ভাষায় তাঁর দখল ছিলো মাতৃভাষার মতোই। ফলে বার্লিনে অবস্থানকালে তিনি হেগেলের মৌলিক গ্রন্থাবলী এবং অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ইয়েসপার্স ও হাইডেগারের গ্রন্থাবলী পাঠের সুযোগ পান। অবশ্য এর আগেই তিনি পাঠ করেন প্রপঞ্চবাদী দার্শনিক হুসার্লের রচনাবলী। এমনি অবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধের প্রশ্ন তাঁকে তাড়িত করতে থাকে। ফলে তিনি প্রয়াসী হলেন নিজের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের প্রতি। এ অবস্থায় ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হলো তার প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ 'ইমাজিনেশন'। এর পর প্রকাশিত হলো ১৯৩৯ সালে 'স্কেচ ফর দি থিওরি অব ইমোশন' এবং ১৯৪০ সালে 'দি সাইকোলজি অব ইমাজিনেশন'। ফলে তিনি আসন লাভ করলেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের সারিতে।

১৯৩৯ সালে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন এবং ১৯৪০ সালে জার্মানদের হাতে বন্দী হন। এক বছর বন্দী থাকার পর তিনি ছাড়া পান। এ সময়ে যুদ্ধের শেষ অবধি তিনি প্রকাশ্যে শিক্ষকতা এবং গোপনে প্রতিরোধ সংগ্রামের কাজ করেন। প্যারিস মুক্ত হলে তিনি শুধু লেখাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন।

যুদ্ধের সময়ে তিনি কয়েকটি অসামান্য রচনা সমাপ্ত করেন। এর মধ্যে 'নসিয়া' নামক উপন্যাস, 'দ্য ফ্লাইজ' নামক নাটক অধিক উল্লেখযোগ্য। নসিয়া ডায়েরী ধরনের রচনা, প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে, যার নায়ক আসলে সার্ত নিজেই। এ ছাড়া যুদ্ধোত্তর কালের তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক হলো, 'নো এক্সিট' (১৯৪৪), 'ডার্টি হ্যাণ্ডস'

(১৯৪৮), 'লুসিফার এণ্ড দ্য লর্ড' (১৯৫১), 'নেকারসভ' (১৯৫৬), 'লুজার উইংস' (১৯৬০) প্রভৃতি।

উপন্যাস হিসেবে নসিয়ার পরে তিনি রচনা করেন উপন্যাসমালা 'স্বাধীনতার পথ'। এর প্রথম খণ্ড 'দি এজ অব রিজন' (১৯৪৫), দ্বিতীয় খণ্ড 'দি রিপ্রাইভ' (১৯৪৫), তৃতীয় খণ্ড 'আয়রণ ইন দ্য সোল' (১৯৪৯)। চতুর্থ খণ্ড অসমাপ্ত থেকে যায়।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য সম্পর্কিত 'হোয়াট ইজ লিটারেচার?', সামাজিক ও রাজনৈতিক রচনা 'সিচুয়েশন', সমালোচনামূলক গ্রন্থ 'বোদলেয়ার' এবং 'সাঁ জেনে : এক্টর এণ্ড মার্টার'। এছাড়া রয়েছে তার আত্মজীবনমূলক গ্রন্থ 'ওয়ার্ডস', যার অসাধারণ সাহিত্যমূল্য বিচার করে সার্তকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু এ সম্মানকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। এবং সে সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন : বর্তমান পরিস্থিতিতে নোবেল পুরস্কার এমন এক সম্মান, যা পাশ্চাত্যের লেখকদের এবং প্রাচ্যের বিদ্রোহীদের সংযত করে দেয়। আলজেরিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যখন আমরা ১২১ জনের স্বাক্ষরিত বক্তব্য প্রকাশ করি, তখন যদি আমাকে পুরস্কার দেয়া হতো তাহলে হয়তো ধন্য হয়ে গ্রহণ করতাম। কারণ তখন তা শুধু আমাকে নয়, স্বাধীনতার জন্য আমরা যে লড়াই করছিলাম তাকেও সম্মানিত করা হতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। বরং বর্তমানে, সংগ্রামের শেষে আমাকে পুরস্কৃত করা হলো।

আজীবন রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো এ মহান দার্শনিকের। কমিউনিস্ট পার্টির সাথেও ছিলো তাঁর গভীর সম্পর্ক। তবে ১৯৪৯ সালে তিনি 'রিপাবলিক্যান ডেমোক্রেটিক র্যালী' নামক যে সংগঠনটি গড়তে তুলেছিলেন, তা ১৯৫২ সালেই ভেঙে যায়। এর পর তিনি আরো গভীর সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে থাকেন কমিউনিস্টদের

সাথে। আর এ সময়ে তিনি বলেন যে, মার্কসবাদ দ্বান্দ্বিক হলে তিনিও মার্কসবাদী। ১৯৫১ সালে আলবেয়ার কামু 'লা হোম রিভোল্ট'-এ সাম্যবাদের সমালোচনা করে বক্তব্য প্রকাশ করলে, তার সাথে সার্ত্রের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে।

১৯৫২ সালে তিনি অংশ গ্রহণ করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে। আবার ১৯৫৬ সালে রাশিয়া হাঙ্গেরীতে আক্রমণ চালালে তিনি তার প্রবল বিরোধিতা করেন এবং ফ্রান্সের রুশপন্থী কমিউনিস্টদের সাথে তার বিরোধ দেখা দেয়। ১৯৫৪ সালে আলজেরিয়ার যুদ্ধের সময়ে সার্ত্র প্রবল বিরোধিতা করেন ফরাসী আগ্রাসী বাহিনীর, আর আলজেরীয় মুক্তি যোদ্ধাদের উপর ফরাসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন দেশে ও বিদেশে। ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাই, ১৯৬৬ সালে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের উদ্যোগে গঠিত 'যুদ্ধাপরাধ আদালত'-এ সার্ত্র প্রথমে সদস্য ও পরে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সালে এ আদালতের স্টকহোম সম্মেলনে আন্তর্জাতিক আইন লংঘনের জন্য দায়ী করেন মার্কিন সরকারকে। সব শেষে, সার্ত্র সোচ্চার হয়েছেন ১৯৭৯ সালে ভিয়েতনামকে আক্রমণকারী বলে নিন্দা করতে এবং কম্পুচিয়াকে সমর্থন জানাতে।

১৯৬৮ সালে ফরাসী দৈনিক 'লা কজ দ্য পিপল' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে, সার্ত্র এ নিষিদ্ধ পত্রিকা ফেরি করেন রাস্তায় রাস্তায়। এ কারণে তার কারা ভোগও করতে হয়, সাত দিন। কিন্তু স্বাধীনতাকামী এ পুরুষ কোনো অন্যায়কেই বিনা প্রতিবাদে চলতে দেন নি, হোক তা দেশের বা বিদেশের। সে কারণেই নিরীহ বাঙালিদের উপর ১৯৭১ সালে পাক সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত অত্যাচারকে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছেন।

১৯৫৪ সালে তিনি ভ্রমণ করেন সোভিয়েত রাশিয়া, ১৯৫৫ সালে গণচীন এবং ১৯৫৯ সালে কিউবা। এছাড়া ইতালীসহ পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করেন তিনি।

ফ্রান্সে অবস্থানকালে তিনি থাকতেন হোটেলে হোটেলে। মায়ের বাড়ি হতে বের হবার পর তার নিজস্ব কোনো ঘর-বাড়ি ছিলো না। আজীবন সঙ্গিনী ব্যুভেয়েরকে সাথে নিয়ে তিনি হোটেল-রেস্তোরাঁয়ই থাকতেন। সম্ভবত এ ধরনের জীবন যাপনের মধ্য দিয়েও তিনি এক বিচিত্র রকমের স্বাধীনতাই ভোগ করতেন।

আজীবন স্বাধীনতার পূজারী পুরুষ সার্ত যখন ১৯৮০ সালের ১৫ এপ্রিলের মধ্যরাতে প্রয়াত হলেন, তখন প্রথম শোকবার্তা পাঠালেন 'তার একজন নবীন পাঠক হিসেবে' এলিসি প্রাসাদ থেকে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ভালেরী জিস্‌কা দেঁা-স্‌তা। সম্ভবত সার্তের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিলো বলেই শোকবার্তায় তিনি বলেন, "যেহেতু আজীবন সরকারী সব সম্মানকে অগ্রাহ্য করেছেন সার্ত, সেহেতু প্রেসিডেণ্ট হিসেবে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে তার প্রতি অমর্যাদারই তুল্য। তাই তার অপছন্দনীয় কোনো উপায়ে তাকে শ্রদ্ধা জানানো আমার উচিত হবে না। যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধোত্তর কালে তাঁর লেখার একজন তরুণ পাঠক হিসেবে সার্তের প্রয়াণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন এ-কালের মহত্তম নক্ষত্রের পতন।"

তাঁর প্রয়াণে এক সপ্তাহব্যাপী আনুষ্ঠানিক শোক জ্ঞাপন করেন প্যারিসের জনগণ। তার মরদেহ নিয়ে মিছিল করেন প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ, হাসপাতাল হতে সমাধিস্থল পর্যন্ত। আর এদের সবার পুরোভাগে কালো কাপড় আচ্ছাদিত গাড়িতে ছিলেন সার্তের আজীবন সঙ্গিনী, প্রখ্যাত লেখিকা ও মননশীল ব্যক্তিত্ব সিমন দ্য ব্যুভেয়ের ও তাঁদের পালিতা কন্যা আর্লেত এল-কাইম।

২. সার্ত্রীয় দর্শনের মূল বক্তব্য : 'অস্তিত্ববাদ' বলতে কি বোঝায়, সংক্ষেপে ও সহজে এ কথার উত্তর দেয়া বেশ কঠিন। এর বহুবিধ ব্যবহার দেখে এক সময় সার্ত নিজেই বলেছিলেন যে, যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে 'অস্তিত্ববাদ' শব্দের মাধ্যমে এখন কিছুই বোঝা যায় না। আসলে কথা ঠিক। এর সংজ্ঞায়ন সহজ নয়। কারণ অস্তিত্ববাদ কোনো দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বরং দার্শনিকীকরণের অন্যতম পন্থা। একে দার্শনিক তত্ত্বরূপে বিবেচনা না করে সামাজিক-রাজনৈতিক-নৈতিক চিন্তাধারা ভাবাই যথার্থ।

সার্তের মতে 'অস্তিত্ব' শব্দের গভীর তাৎপর্য বিদ্যমান। মানুষ ছাড়া অন্য সব কিছু 'বিদ্যমান' থাকে। কিন্তু একমাত্র মানুষই অস্তিত্বশীল হয়। তবে যে মানুষ পশুর মতো দায়িত্বহীনভাবে জীবন যাপন করে, সে শুধু বেঁচেই থাকে, সে অস্তিত্বশীল হয় না। একমাত্র সচেতন ও স্বাধীনভাবে দায়িত্বশীল মানুষই অস্তিত্বশীল।

এ ক্ষেত্রে সার্ত মানুষ বলতে কোনো সাধারণ বা সার্বিক মানব প্রকৃতি বোঝান নি। তিনি বুঝিয়েছেন বিশেষ ও মূর্ত মানুষকে। সার্তের কাছে এ ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বশীল হবার অর্থ হলো, স্বাধীন ও সক্রিয়তার ভিত্তিতে 'আমি কি হবো' তা-ই নির্বাচন করা।

তাঁর মতে **মানুষ** প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার সম্মুখীন হয় এবং নতুন করে নিজেকে তৈরি করে। আর এ তৈরি করার মাধ্যমেই সে নিজের স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রথমে অস্তিত্বশীল হয় এবং পরে অস্তিত্বের ভিত্তিতে সাধারণ সত্তা গঠন করে। অতএব, ব্যক্তি সত্তার অস্তিত্ব সারধর্মের বা সামগ্রিক সত্তার পূর্বগামী।

তিনি আরো বলেন, ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নয়। অতএব মানব সত্তা কোনোরূপ স্রষ্টার ইচ্ছায় আবির্ভূত হয় নি। বরং, ব্যক্তি মানুষ প্রথমে আবির্ভূত হয়ে, নিজের কর্মের মাধ্যমে তথা মূর্ত অস্তিত্বের প্রকাশের

মাধ্যমেই সারসত্তাকে তৈরি করেছে। অতএব যে কোনো মূল্যায়ন ব্যক্তিসত্তারই মূল্যায়ন। তাই, সত্যও ব্যক্তিসত্তার উপলব্ধির তথা আত্মিক বিষয়। এর কোনো বিমূর্তিরূপ নেই। আমার বিষয় গত সম্পর্কের উপরই সত্য নির্ভরশীল। এর বাইরে বুদ্ধিগত বা বিষয়গত কোন সত্য অস্তিত্বশীল নয়।

৩. **ঈশ্বরের ধারণা :** সার্ত সব কিছুর চেয়ে মানুষকে অধিক মূল্য দিয়েছেন। তিনি মানুষের জন্য এমন এক পৃথিবীর কল্পনা করেছেন, যেখানে মানুষই নিয়ন্ত্রক, ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা বা অস্তিত্ব নেই।

'বিয়িং এণ্ড নাথিংনেস' নামক তার বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি মানুষের অধিকতর মর্যাদা বুঝানোর জন্য, মানুষ ও বস্তুর পার্থক্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষ অপূর্ণ, আর বস্তু পূর্ণ সত্তা। কারণ, বস্তু পরিবর্তিত হয় না বা হতে পারে না। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই পরিবর্তনশীল অপূর্ণ সত্তা। সে সব সময়ই এ অপূর্ণতা বোধ হতে পূর্ণতা লাভ করতে প্রত্যাশী ও প্রয়াসী। আর, এ পূর্ণতা লাভের জন্যই মানুষ হতে চায় ঈশ্বর। যদিও তার এ প্রত্যাশা কখনোই পূর্ণ হয় না।

ঈশ্বর সম্পর্কিত সার্তীয় বক্তব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আর তা হলো : প্রথমত, সার্তের মতে প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্মে বর্ণিত ঈশ্বর নেই। প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন। তার কোনো সাধারণ ধর্ম বা সার্বিক রূপ নেই। আর,সার্বিক সত্তা প্রণয়ন করার কোনো ঈশ্বরও নেই। দ্বিতীয়ত, যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তাহলেও সে মানুষের কোনো প্রয়োজনে আসে না। কারণ প্রত্যেক মানুষকেই তার নিজ নিজ ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ গঠন করতে হয়। সে ছাড়া অন্য কোনো সত্তা নেই, যে সত্তা ব্যক্তি মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ বা পরিচালন করতে পারে। তৃতীয়ত, ঈশ্বর হলো চেতন ও অচেতনের এক বিরোধাত্মক সমন্বয়। এ ঈশ্বর না-সৃষ্টি কর্তা, না-স্বর্গীয় সত্তা। বরং এ ঈশ্বর

জাগতিক মানুষ। যে মানুষ পূর্ণতা লাভের পরিণতিতে অচেতন বস্তু-সত্তায় পরিণত হতে চায় না। বরং সে চায় চেতন-অচেতন সত্তার মিলনের ভিত্তিতে পরম পুরুষে পরিণত হতে। সার্ত্রীয় দর্শনে এ পরম পুরুষই হলো ঈশ্বর।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার প্রবক্তা সার্ত্রের ঈশ্বর সম্পর্কিত তত্ত্ব মানুষের চরম রূপের প্রত্যাশী। কিন্তু যে কোনো চরমরূপ লাভ অবশ্যই মানুষের স্বরূপকে সীমিত করে, তার স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করে।

৪. **সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদে স্বাধীনতার ধারণা:** সার্ত্রের মতে মানুষ বিচ্ছিন্ন বা বিশিষ্টভাবে নয়, সামগ্রিকভাবেই অস্তিত্ববান। এ মানুষ প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল। কারণ, ক্রিয়াশীলতাই মানবিক গুণ। আর, অস্তিত্ব পূর্ণ ও মূর্ত রূপ লাভ করে ক্রিয়াশীলতা বা কর্মের ভিত্তিতে।

তিনি বলেন, কর্ম আবার ব্যক্তিগত হলেও, সমগ্র ব্যক্তিই এর সাথে জড়িত। চিন্তা, অনুভূতি ও আত্মিক সংকল্প কর্মেরই অন্তর্গত। কারণ, উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়া ক্রিয়ামাত্র। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াই মাত্র কর্ম। কর্ম তাই সচেতন উদ্দেশ্য উপলব্ধি সূচক। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে, কর্ম অভাববোধ সূচক। তাই কোনো কিছু সচেতনভাবে করাই কর্ম। সে কারণে কর্ম আবার ব্যক্তির ভবিষ্যৎ সূচকও। আর এ ভবিষ্যৎ সূচক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া মানেই হলো বর্তমান অবস্থাকে অস্বীকার করে, তাকে পরিবর্তিত করে এগিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে বর্তমানকে অস্বীকার করে ভবিষ্যতের প্রত্যাশাই স্ব-হেতু সত্তার বা চেতনার অভিক্ষেপ। আর এ কারণেই সার্ত্রের মতে চেতনার অভিক্ষেপের জন্যে সচেতন কর্মই স্বাধীনতা।

সার্ত্রের মতে, ভবিষ্যতের দিকেই চেতনার যাত্রা। আর এ যাত্রাই আসলে স্বাধীনতা বা স্বাধীন চেতনা। এ স্বাধীন চেতনা যেহেতু প্রতিনিয়ত ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত, সেহেতু এর সংজ্ঞায়ন সম্ভব

নয়। শুধু এটুকুই বলা যায় যে, চেতনা হলো 'তাই যা তা নয়' এবং 'তাই নয় যা তা।'

মানবজীবন সর্বদাই অভাববোধ ও অপূর্ণতা। কারণ, মানুষের প্রত্যাশা কখনই পরিপূর্ণ হয় না। মানুষ পরিপূর্ণরূপে যা চায় তা পায় না। এ চাওয়া-পাওয়ার মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য মানবজীবনে অভাববোধ সূচক। তা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এ ধরনের অভাববোধই মানুষের অস্তিত্বের পরিচায়ক।

সার্তের মতে, অস্তিত্বশীল হওয়া এবং স্বাধীন ও সক্রিয়ভাবে নির্বাচন করা সমার্থক। কারণ মানুষ প্রতিনিয়তই নির্বাচন করে এবং নিজ দায়িত্বে নিজেকে তৈরি করে। আর এ ধরনের নির্বাচন আবার স্বাধীনতার সূচক। এ স্বাধীনতা ব্যক্তিসত্তার কোনো গুণ নয়, বরং তার অংশ। আর সে কারণেই সার্ত 'অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ' গ্রন্থে বলেছেন যে, মানুষ স্বাধীন, আর স্বাধীনতাই মানুষ। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, মানুষ স্বাধীন হলেও, সে 'স্বাধীনতা ও নির্বাচন করা' থেকে স্বাধীন নয়। নির্বাচন তাকে করতেই হয় এবং **স্বাধীনতার** দাসত্বও তাকে মেনে নিতে হয়।

তাই সার্তের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হলো নির্বাচিত স্ব-শাসন। এ প্রসঙ্গে সার্ত আরো বলেন যে, মানুষের এ স্বাধীনতা কোনোভাবেই তার পরিবেশ, দৈহিক অবস্থা, মানসিক গড়ন, মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা সীমিত নয়। কারণ, এসব অবস্থা বিদ্যমান থাকলেও, মানুষ স্বাধীন-ভাবে নির্বাচন করতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যদিও স্বাধীনতা মানব প্রকৃতির মাঝে বিদ্যমান কোনো অতি প্রাকৃতিক শক্তি নয়। আসল কথা হলো আমরা বর্তমানে যা, তার জন্যই দায়ী। আর তা-ই হলো বাস্তবতা।

'বিয়িং এণ্ড নাথিংনেস' গ্রন্থে সার্ত আরো বলেছেন যে, চেতনাই স্বাধীনতা। অর্থাৎ বর্তমান অবস্থাকে নাকচ করে, ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা সম্পর্কে সচেতনতার মাঝেই স্বাধীনতার মূলার্থ নিহিত।

৫. সার্তীয় মানবতাবাদ ঃ সার্তের দর্শন আস্তিকতার দর্শন। একথা অনেকেই স্বীকার করেন। সার্ত জীবিত থাকা কালেও এ ধরনের অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর চেষ্টা করেছিলেন এরূপ অভিযোগের উত্তর দিয়ে, অস্তিত্ববাদী দর্শনকে আস্তিকতার অভিযোগ-মুক্ত করতে।

সার্তের মতে, ব্যক্তি মানুষ কোনো কিছু নির্ধারণ করে ব্যক্তিকভাবেই। কিন্তু নির্বাচন বা নির্ধারণ সে সমগ্র মানব জাতির জন্যই করে। কারণ, নির্বাচনের সময়ে সে ভাবে কোন্ পথ সবার জন্য কল্যাণকর। এ ক্ষেত্রে সে ভাবে যে, পৃথিবীতে সে একা নয়। তাই একার জন্য নির্বাচনও সে করতে পারে না। সে মানব জাতির প্রতিনিধি। তাই সমগ্র মানব জাতির জন্য যা কল্যাণকর. তাকে তা-ই নির্বাচন করতে হয়। মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করে। কিন্তু মানব-সত্তার বৈশিষ্ট্য হলো উৎকৃষ্টকে মঙ্গলময় বলে বিবেচনা করা এবং মন্দকে অকল্যাণকর রূপে দেখা। প্রত্যেক মানুষ সমাজেই বসবাস করে। তাই ব্যক্তিগত রুচিবোধ সমগ্র মানব সমাজের রুচিবোধের প্রকাশক বা প্রতীক। প্রত্যেক মানুষের চিন্তা সমগ্র মানব জাতির চিন্তার দ্যোতক। তাই নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব রয়েছে যা সমগ্র মানব সমাজের জন্য ভালো, তাকে নির্বাচন করা এবং যা সমগ্র মানব সমাজের জন্য অমঙ্গলকর, তাকে বর্জন করা, নাকচ করা। আর এ নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্তি জড়িত হয় সমগ্র মানব জাতির নির্বাচনের, মঙ্গলে-অমঙ্গলের সাথে।

সার্তের মতে, সার্বিক মানব প্রকৃতির কোনো অস্তিত্ব নেই। যদিও সর্বজনীন মানবিক অবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ, মানুষের ঐতিহাসিক অবস্থান বিভিন্ন হতে পারে একজন গরীব, আবার একজন ধনী হতে পারে। তা সত্ত্বেও, কতগুলো প্রশ্নে সব মানুষই এক ধরনের সর্বজনীন মানবিক অবস্থার মাঝে অবস্থান করছে। আর তা হলো অস্তিত্ব, কর্ম ও মৃত্যু। বাস্তবতা বা বিষয়গতভাবে এসব সর্বজনীন অবস্থার সাথে সব মানুষের পরিচয় রয়েছে। যদিও বিষয়ীগতভাবে এগুলো প্রত্যেক ব্যক্তিক সত্তার ব্যক্তিগত অনুভূতি-নির্ভর।

সার্ত আরো বলেন যে, প্রত্যেক উদ্দেশ্যেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তথা বিশিষ্টতা রয়েছে। আবার এরই রয়েছে সর্বজনীন মূল্য। তবে উল্লেখ্য যে, এ সর্বজনীনতা পূর্বত সিদ্ধ কোনো ধারণা নয়। বরং স্বাধীনভাবে নির্বাচন করে, একের সাথে অন্যের পরিচয়ের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে মানুষ এ সর্বজনীন অবস্থা সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তিরই দায়িত্ববোধ রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে। মানবিক বিশ্বে ব্যক্তি বিভিন্ন অবস্থার মাঝে, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের মাঝে নিজেকে পায়। আর এ অবস্থার বাস্তবতায়ই সে নির্বাচন করে। যে নির্বাচনের সাথে সমগ্র মানব জাতি জড়িত। এ অবস্থায়, তার নির্বাচন অন্যান্য ব্যক্তির সাথে জড়িত বলে সে কোনো-ভাবেই সামগ্রিক দায়িত্ববোধ এড়িয়ে যেতে পারে না। সে কারণেই তার দায়িত্ববোধ সমগ্র মানব জাতির দায়িত্ববোধের অংশ এবং সমগ্র মানব জাতির জন্যে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ-ই হলো সার্তের ব্যক্তিক চিন্তার মানবিক রূপ।

৬. সার্তীয় অস্তিত্ববাদ ও মার্কসীয় দর্শন ঃ সার্ত স্বীকার করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে একটা মাত্র মূল দর্শন থাকে। আর সে দর্শনের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠে ভাবাদর্শ। ব্যক্তি উপলব্ধি করুক বা না করুক, তাকে

যুগের মূল দর্শনের হয় পক্ষে, আর না হয় বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে। আর বর্তমান যুগের মূল দর্শন হলো মার্কসীয় দর্শন। অস্তিত্ববাদ হলো সে বিচারে মার্কসীয় দর্শনের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা ভাবাদর্শ। এর প্রয়োজনীয়তা ও অবদান হলো মার্কসীয় তত্ত্বের কোনো-না কোনো দিককে আলোকিত, গভীর ও প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে।

সার্ত তার 'দ্য ক্রিটিক অব ডায়েলেকটিক্যাল রিজন' গ্রন্থে মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কীত নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং অস্তিত্ববাদ ও মার্কসবাদের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন।

সার্তের মতে, মার্কসবাদ ব্যবহারিক ও আশাবাদের দর্শন। মার্কসবাদ বুর্জোয়া দর্শনের বিপরীতে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে সত্য। কিন্তু অস্তিত্ববাদী সমস্যাগুলোর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয় নি। তাই অস্তিত্ববাদের দায়িত্ব হলো মার্কসবাদকে পরিপূর্ণ রূপ প্রদান করা।

বিচার করলে দেখা যায়, সার্ত মার্কসবাদী ছিলেন না। অস্তিত্ববাদীর পক্ষে মার্কসবাদী হওয়া সম্ভবও নয়। তবুও একথা সত্য যে, তিনি মার্কসবাদকে গভীরভাবে না-হলেও, আবেগ দিয়ে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছেন। মার্কসবাদের ব্যবহারিক দিকগুলোকে প্রয়োগ করার জন্যে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সাথে একাত্ম হয়ে জীবনের বেশ কিছুকাল কাজও করেছেন। তবে তিনি সব কিছু বিচার করেছেন ব্যক্তিক আত্মিকতার ভিত্তিতে। তাই, মার্কসবাদের মানবিক ও ব্যবহারিক দিককে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু, দার্শনিক ও যৌক্তিক দিককে, বিশেষভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ তার মতে, মানবিক চেতনা ও মানবিক আত্মিকতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সার্তের জীবন ও দর্শন অলোচনার প্রেক্ষিতে উপসংহারে বলা যায়, তিনি যদিও বলেছেন যে, প্রথমত মার্কসবাদই আমাদের যুগের

যথার্থ ও শ্রেষ্ঠ দর্শন এবং দ্বিতী: মার্কসবাদ বিরোধী তত্ত্বকে প্রাক-মার্কসবাদী অবস্থানে ফিরে যেতে হবে, আর না হয় মার্কসবাদ কর্তৃক সমালোচিত হয়ে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। তবুও, মার্কসবাদকে তিনি বিচার করেছেন অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিতে। ফলে তাঁর দর্শন অস্তিত্ববাদ ও মার্কসবাদের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াসে স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে তা মার্কসবাদের প্রভাবে অস্তিত্ববাদের মূল অবস্থান থেকেও সরে এসেছে। ফলে, সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদ যতই মার্কসীয় দর্শনের ছত্রছায়ায় বিকশিত ভাবাদর্শের কথা বলুক-না-কেন, এ দর্শন মানবকল্যাণকামী অথচ আবেগসর্বস্ব, দুর্বল যুক্তিসম্পন্ন, বিচ্ছিন্নতাবোধাক্রান্ত উদ্দীপক দর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

অস্তিত্ববাদী তত্ত্ব : পর্যালোচনা

অস্তিত্ববাদী দর্শনকে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। এখন এর তত্ত্ব সম্পর্কে, বিশেষভাবে মূল বিষয়বস্তু 'অস্তিত্ব,' পদ্ধতি 'আত্মিকতা' এবং পরিচায়ক বিষয় 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।

ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব সার্বিক অস্তিত্বের পূর্বগামী

সাধারণভাবে অস্তিত্ববাদী তত্ত্ববিদ্যা বিশিষ্টসত্তা বা ব্যক্তি সত্তা ও সার্বিক-সত্তা বা সারধর্মের পার্থক্য বিচার করে, ব্যক্তিসত্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে প্রয়াসী হয়। এর ভিত্তিতেই অস্তিত্ববাদীরা যে আসল সমস্যার কথা বলেছেন, আর সমাধানেও প্রয়াসী হয়েছেন, তা হলো 'ব্যক্তি-সত্তার অস্তিত্ব সার্বিকসত্তার পূর্বগামী'।

উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত অধিকাংশ দার্শনিক সার্বিক সত্তা বা সারধর্মকে স্থান দিতেন ব্যক্তিসত্তা বা বিশিষ্টসত্তার ঊর্ধ্বে। তাই তাদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে সার্বিক সত্তাবাদী হিসেবে। সার্বিক সত্তাবাদীদের সাথে অস্তিত্ববাদীদের মূল বিরোধও বিশিষ্টসত্তা এবং সার্বিক সত্তার মূল্য নিরূপণের প্রশ্নে। আর এ কথাও সত্য যে, অস্তিত্ববাদী দর্শনকে অগ্রসর করে নেয়ার প্রয়োজনেই পূর্বোক্ত সব সার্বিক সত্তাবাদীদের বিরোধিতা করতে হয়েছে, এবং এগুতে হয়েছে বিরোধিতার মাধ্যমে।

আর সে কারণেই অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারাকে বিচার করা প্রয়োজন তার বিরোধী মতের প্রেক্ষাপটে। আর সে প্রয়োজনেই কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন বিরোধী মতেরও।

গ্রীক দার্শনিক প্লাটো দু'টো জগতের বিষয়গত জগত ও চিন্তা জগত বা বিষয়ীগত জগত বা ভাব জগতের কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মানুষের মতে বিষয়গত জগতই বাস্তব; সেখানে রয়েছে রাশি রাশি ঘর-বাড়ি, জন্তু-জানোয়ার, গাছ-পালা প্রভৃতির অস্তিত্ব। প্লাটোর মতে বিষয়গত জগত বিষয়ীগত জগত বা ভাবজগতেরই প্রতিরূপ। আর বিষয়ীগত বা ভাব জগতই খাঁটি। অন্যদিকে, বিষয়গত বা বস্তুগত জগত বিষয়ীগত বা ভাব জগতের অবভাস মাত্র। 'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লাটো তাঁর এ মতবাদকে ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন।° সত্যি বলতে কি, এ বক্তব্যের মধ্য দিয়েই প্লাটো একটা সার্বিক বা সামগ্রিক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং অন্য সব সত্তার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন এ সামগ্রিক সত্তাকে। আর এ কারণেই, অস্তিত্ববাদী দর্শন প্লাটোর এসব বক্তব্যকে বিরোধিতা করে দারুণভাবে।

সামন্তযুগের দার্শনিক সেণ্ট অগাস্টিনও প্রাধান্য দিয়েছেন সার্বিক-সত্তাকে। তিনি সার্বিক সত্তাকে তুলনা করেছেন স্বর্গীয় আত্মার সাথে। এ স্বর্গীয় আত্মাকে তিনি জ্ঞানের উৎসরূপে উল্লেখ করে বলেছেন যে, স্বর্গীয় আত্মার আলো জগতের প্রতিটি মানুষকে আলোকিত করে, জ্ঞান দান করে। বুর্জোয়া যুগ পর্যন্ত অনেক লোকই অগাস্টিনের এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অতি সাম্প্রতিককালে বুর্জোয়া তথা রেনেসাঁ যুগের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা ধর্মীয় নিগড় থেকে নিজেদের মুক্ত করে স্বাধীন চিন্তার পথ উন্মুক্ত করতে প্রয়াসী হন। বুর্জোয়া সভ্যতার উন্মেষ কালের দার্শনিক দেকার্ত ও বেকনই প্রথম মুক্ত চিন্তার বিকাশ ও ধর্মীয় শিকল-ভাঙার বিদ্রোহী সৈনিক

হিসেবে অবতীর্ণ হন। এ বিদ্রোহী সৈনিকরা পথের দিশারী হলেন ঠিকই, কিন্তু পথ কণ্টকমুক্ত করতে পারলেন না। কারণ বিজ্ঞানের অনগ্রসরতা ও চিন্তার দারিদ্র্য। তখনও অনেক বিজ্ঞানী পার্থিব সত্তার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতেন কোনো এক অপার্থিব ও সার্বিক সত্তাকে। আর এ প্রবণতা বিদ্যমান থাকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঈশ্বরভিত্তিক চেতনা অবলুপ্ত হতে থাকে। আর তার সাথে সাথে অবলুপ্ত হতে থাকে ধর্মভিত্তিক সার্বিক সত্তাবাদও। কিন্তু এতেই সার্বিক সত্তাবাদ অবলুপ্ত হলো না, বরং নতুনভাবে সম্ভবত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিতই হলো। তবে এ পরিবর্তন পরবর্তীকালে অস্তিত্ববাদী দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত ভূমিকা পালন করে।

অস্তিত্ববাদীরা প্রায় সবাই-ই তাদের চিন্তাধারাকে পরোক্ষভাবে নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে রূপায়িত ও প্রচারিত করতে উদ্যোগী ছিলেন। দার্শনিক গ্রন্থের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন খুব কম সংখ্যকই। যদিও তাদের মধ্যে অস্তিত্ববাদী ভাবধারার আধুনিক উদ্‌গাতা কিয়ের্কেগার্দের ক্ষেত্রে একথাই বেশি প্রযোজ্য। কারণ, দার্শনিক গ্রন্থই ছিলো তাঁর বক্তব্য প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম। ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্ত্র এবং তাঁর একান্ত সহকর্মী সিমন দ্যা ব্যুভেয়ের দার্শনিক গ্রন্থের তুলনায় গল্প-উপন্যাস-নাটকের মাধ্যমেই বক্তব্য প্রকাশে বেশি আগ্রহী ছিলেন। আবার মার্টিন হাইডেগারের ক্ষেত্রে একথা খুব বেশি প্রযোজ্য নয়।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিক নীটশে তাঁর অস্তিত্ববাদী চিন্তা প্রকাশের সময়ে ব্যক্তি বিশেষের আবেগ, উদ্বেগ ও সিদ্ধান্তকে সবার উপর পরম সত্য বলে গণ্য করতেন। তাঁর অস্তিত্ববাদী চিন্তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি দার্শনিক সমস্যাগুলোকে গ্রহণ করতেন সমকালীন

জীবন ও সমস্যাবলী হতে। পূর্বোক্ত দার্শনিকদের উত্থাপিত সমস্যা থেকে নয়।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগারের মতে, জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু রূপে আমরা কোনো কিছুকে ধরে নিতে পারি না। এমন কি নিজেরা জ্ঞাত হবার পরও জ্ঞাতার স্বরূপ আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। আর এ যুগ্ম অজ্ঞেয়তার ভিত্তিতে-একমাত্র জ্ঞাত ক্ষণিক ও মূল্যহীন অবভাসই আমাদের জ্ঞানের পুঁজি। হাইডেগারের দর্শনে আমরা একটা আবেগ ব্যাকুলতা লক্ষ্য করি, যাকে পরিত্যাগ করে, মানবীয় অস্তিত্বকে যথার্থরূপে পাবার প্রয়োজনে; বৈচিত্র্যময় এ বিশ্বের সাথে মোকাবিলা করার জন্যে স্বকীয় নির্বাচনের ভিত্তিতে নিজের দায়িত্বশীল সত্তা সৃষ্টি করা প্রয়োজন ছিলো। একজন অস্তিত্ববাদীর জন্য এটা ছিলো তাঁর দর্শনের দুর্বলতা।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দ তাঁর দর্শনে ব্যক্ত করেছেন যে, বাস্তব জিনিসকে অবাস্তব কল্পনার সলিলে অবগাহন না করিয়ে, অবাস্তব জিনিসকেও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা এবং অনুধাবনে প্রয়াসী হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে সার্বিকতাবাদী দার্শনিকরা তাঁদের জিজ্ঞাসু মন দিয়ে কেবল সমগ্র মানব জাতির কথাই চিন্তা করেছেন, এবং ব্যক্তিকে সর্বদাই ঢেকে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন অবাস্তব কল্পনার ফানুসে।

অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কির মতে, মানুষ প্রত্যাশা করে স্বনিয়ন্ত্রিত নির্বাচন, তথা স্বাধীনতা। তবে সেজন্য তাকে যতটা ত্যাগই স্বীকার করতে হোক-না-কেন, কিংবা সে স্বাতন্ত্র্য তাকে যেখানেই নিয়ে যাক না-কেন।

তিনি আরো বলেন যে সাধারণত মানুষ সব সময়ই স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের এবং ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা চায়। যদিও, সব সময়ে ও সর্বত্র তা আমাদের অনুভবে ধরা পড়ে না।

ঔপন্যাসিক আলবেয়ার কাম্যু তাঁর বিভিন্ন লেখায় অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা প্রচারে সচেষ্ট হয়েছেন। কাম্যুর সাহিত্য সাধনার মূলমন্ত্র একটা করুণ বাণী: জীবন মূলত এবং সম্পূর্ণত অসম্ভাব্যতা। আর যুক্তি বা বুদ্ধি কখনোই তার অতল গহ্বরে প্রবেশ করতে পারে না। কাম্যু তাঁর 'দ্য মিথ অব সিসিফাস' নামক গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, একজন সৎ লোক সর্বদাই নিজের দৃঢ় বিশ্বাসকে ভিত্তি করে কাজ করে। তিনি যদি মনে করেন যে, জগতে বেঁচে থাকা অর্থহীন, তবে তার অবশ্যই আত্মহত্যা করা উচিত। কারণ তার কাছে বেঁচে থাকা এক ধরনের সবিরোধিতা. সহজ কথায় বলা চলে আত্মপ্রতারণা। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত কাম্যুর বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য প্লেগ'-এ তিনি স্পষ্টভাবে বুঝাতে প্রয়াসী হয়েছেন যে, যারা শক্তিশালী তাদের কর্তব্য হলো দুর্বলকে রক্ষা করা এবং তাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নায় অংশীদার হওয়া। কারণ, মানুষের কর্তব্য হলো যত সম্ভব বেশি লোককে মৃত্যুর গহ্বর থেকে রক্ষা করা এবং তাদের অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

১৯৫১ সালে প্রকাশিত কাম্যুর নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য রেবেল'-এ তিনি বলেছেন, 'আমি বিদ্রোহী বলেই আমি অস্তিত্বশীল'। এর দ্বারা তিনি দেকার্তের আত্মসংশয়বাদী বক্তব্যের অনুরূপ, বিদ্রোহী বক্তব্যের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিক অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থে তিনি বলেন, যারা নৈরাজ্যবাদ ও চরম কল্পনাবাদের উপর বিপ্লবকে দাঁড় করাতে চায় তারা কখনোই বিপ্লবের মূল লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না।

কিয়ের্কেগার্দ প্রভাবিত অস্তিত্ববাদী চিন্তাবিদ টিলিচ মত প্রকাশ করেছেন যে, মানব জীবনের নৈরাজ্য দমনের এক অক্লান্ত প্রয়াস ও আশাহীন মানবাত্মার অন্তিম সম্বল হলো দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি আরো বলেন যে, ঈশ্বরের উপরে বিদ্যমান ঈশ্বর হলো অস্তিত্বের সাহস,

যার ভিত্তিতে ঈশ্বরকে তিরোহিত করে আমরা অতীশ্বরের আবির্ভাব ঘটাতে পারি।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জঁ্যা-পল সার্তের অস্তিত্ববাদী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তারই বিভিন্ন রচনায়, বিশেষভাবে তার বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থে। তিনি ছিলেন হুসার্ল ও হাইডেগারের ভাবশিষ্য। তবে হেগেল, নীটশে এবং অন্যান্যদের কাছেও তিনি কিছুটা ঋণী ছিলেন। তাঁর দার্শনিক পরিধি এতটা বিস্তৃত ছিলো যে, তাঁর কৃতি প্রতিযোগিতা চলতে পারতো বার্গসো, আলেকজাণ্ডার, হোয়াইটহেড, কাণ্ট, হেগেল প্রমুখ প্রতিভাদীপ্ত দার্শনিকদের সাথে।

হাইডেগার মনে করতেন যে, মৃত্যুই মোহনীয় সম্ভাবনা। কিন্তু সার্তে এ যুক্তি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে বলেন যে, মৃত্যু মোটেই আমিত্বের সম্ভাবনা নয়। তিনি এ-ও বলেন যে, মৃত্যু বিনাশ নয়। তবে সত্তার মাঝেই নিহিত রয়েছে শূন্যতা। আর শূন্যতার বিনাশের জন্য আবশ্যিক অবস্থাই স্বাতন্ত্র্য। সার্তে তাঁর 'অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ' শীর্ষক পুস্তকে বলেছেন যে, অস্তিত্ববাদ বলতে আমরা এমন একটা মতবাদকে বুঝে থাকি, যে মতবাদ জীবনকে সম্ভব করে তোলে। অন্যদিকে এ মতবাদ এমন নিশ্চয়তা প্রদান করে যাতে প্রতিটি সত্য ও প্রতিটি কর্ম মানুষের পরিবেশ ও তার ব্যক্তিসত্তারই বহিঃপ্রকাশ।

সার্তে ও অন্যান্য অস্তিত্ববাদীরা বলেন যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিসত্তা সার্বিক সত্তার পূর্বগামী। তবে এ প্রসঙ্গে সার্তে আরো বলেন যে, মানুষ মৃত নয়, সে নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে নেয়, এবং খাওয়া-দাওয়া ও বাঁচার ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। তাই এ প্রশ্নে কোনো সৃষ্টিকর্তা বা নিয়ন্ত্রণ-কর্তা তথা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কারণ ঈশ্বর যদি মানুষের নিয়ন্ত্রণকর্তা বা সৃষ্টিকর্তা হন, তাহলে ব্যক্তি মানুষ হবে ঈশ্বর চেতনায় বিদ্যমান সার্বিক মানব বা মানব সম্পর্কীয় সারধর্মের প্রতিরূপ এবং অনুগামী। তাই

তিনি বলেন যে, ঈশ্বর নামক এমন কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি মানুষকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে। তাই, মানুষ নিজে নিজেকে যা মনে করে, নিজেকে যেভাবে গড়ে তোলে, সে আসলে তা-ই। এর বাইরে কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি মানুষকে সাহায্য করতে পারে। মানুষকে তার নিজের উপর এবং নিজস্ব সম্পদের উপর যথেষ্ট পরিমাণে আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর হতে হবে। তাই সার্ত্রে ঈশ্বরের ধারণাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেন এবং নীটশের ভাবধারাকে গ্রহণ করে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তবে একথা সত্য যে, তিনি যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন, তা কোনো ভাবেই যৌক্তিক ভিত্তিসম্পন্ন নয়। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক প্রশ্নে তেমন কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূত্রপাতও করেন নি। বরং প্রায়োগিক দৃষ্টিভংগির ভিত্তিতে তাকে অস্বীকার করেছেন মাত্র।

সার্ত্রের মতে ব্যক্তি মানুষ প্রথমে জন্ম নেয় একক মানব সত্তারূপে। আর একক মানব সত্তাই বিরাজ করে শূন্য রূপে। কারণ, সে কোনো স্থায়ী রূপ বা প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আর এ শূন্যতা হলো অভাববোধ, যা প্রকৃতির মূল রূপ। সার্ত্রের ভাষায় সার্বিক মানব চরিত্র বলে যেমন কিছু নেই, তেমনি সার্বিক মানব চরিত্র গঠন করার কোনো কর্তাও নেই। মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশ ও সমস্যার মধ্য দিয়েই তার নিজস্ব রূপ বা প্রকৃতি গঠন করে। আর এ স্বরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে। কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে কেউ হয় শিক্ষক, আবার কেউ হয় ডাক্তার। আবার এ রূপ বা প্রকৃতিও স্থায়ী নয়। কেননা, ভবিষ্যতে প্রত্যেকেই ইচ্ছে করলে ছাড়িয়ে যেতে পারে বিদ্যমান বা সাময়িক প্রকৃতিকে। পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হয়ে মানুষ নিজেকে, প্রতিনিয়তই নিজেকে আর সাথে সাথে পরিবেশকে পরিবর্তিত করছে। আবার নতুনভাবে মূল্যায়ন করছে সে পরিবেশকেই।

আর এসব কিছুর মূলে রয়েছে এক অভাববোধ, এবং বেছে নেবার স্বাধীনতা। তাই, সার্তের মতে ব্যক্তিসত্তারও কোন স্থায়ী রূপ নেই। ব্যক্তিসত্তার মূল প্রকৃতি বা স্বভাব হলো শূন্যতা। আর এ শূন্যতাই হলো অভাববোধ এবং চেতনার ভিত্তি। অচেতন বস্তুর নির্ধারিত রূপ বা প্রকৃতি রয়েছে। কিন্তু চেতন বস্তুর, অর্থাৎ মানুষের এমন কোনো স্থায়ী বা নির্ধারিত প্রকৃতি নেই। তার স্বরূপের বা প্রকৃতির মূল রূপই হতো অভাববোধ। আর ব্যক্তি মানুষের যেহেতু কোনো স্থায়ী রূপ নেই, সেহেতু ব্যক্তি মানুষের পূর্বগামী সার্বিক কোনো স্থায়ী স্বরূপ বা প্রকৃতিরও প্রশ্ন ওঠে না। সার্তের ভাষায় চেতনা হলো 'প্যুর-সোয়া'। আর এ প্যুর-সোয়ার চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়েই সার্ত বলেন : প্যুর-সোয়া হলো যা ইহা, তা ইহা নহে এবং যা ইহা নহে, তা-ই ইহা। চেতনা প্রতি মুহূর্তেই অতৃপ্তরূপে গতিশীল এবং চৈতন্যের আধার। তবে এ পরিবর্তনের পেছনে কোনো কর্তা নেই, তাই সার্ত আরো বলেন যে, মানুষ স্বাধীন, আর মানুষই হলো স্বাধীনতা। সে কারণে ব্যক্তি মানুষ মাত্রেই নিজের কর্তব্যের জন্য, স্বরূপের জন্য, সর্বোপরি নিজের অস্তিত্বের জন্য দায়ী।

এতক্ষণের আলোচনার ভিত্তিতে বলা চলে যে, সার্তের দর্শন বিশ্লেষণে যে বিষয়টি খুব বেশি করে চোখে পড়ে, তা হলো ব্যক্তিসত্তাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে সমাজকে উপেক্ষা করা হয়েছে, এ দর্শনে। তাঁর দর্শনে মানুষকে তার নিজের এবং কেবল নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত থাকার কথা বলা হয়েছে এবং বাহ্য জগত থেকে রাখা হয়েছে বিচ্ছিন্ন করে। এ প্রসঙ্গে মার্সেলের বক্তব্য হলো, চরম বিপ্লববাদী চিন্তা মানুষকে শুধু একটা বস্তুর সাথেই তুলনা করে। তাঁর মতে মানুষ কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না ; যদিনা তার অবতরণের উৎসের সাথে একটা সুস্পষ্ট যোগাযোগ থাকে। একমাত্র আশা-ভরসা এবং বিশ্বস্ততাই

বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষার সেতুবন্ধন। যিনি একে অস্বীকার করেন, তিনি বস্তুত নিজেকেই অস্বীকার করেন।

অস্তিত্ববাদী চিন্তার এ ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ অনেক সমালোচকের মতে, বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিণতিতে উদ্ভূত হতাশগ্রস্ত মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা। আর অস্তিত্ববাদ এ আত্মকেন্দ্রিকতা হতে উদ্ভূত চিন্তা-চেতনা। তাই এ মতবাদ মানুষকে হতাশার অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে এবং সামাজিক ও সর্বজনীন চিন্তার বিরুদ্ধে মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক ও ভাবোচ্ছ্বাসমূলক অবাস্তব চিন্তা করতে শেখায়।

অস্তিত্ববাদী আত্মিকতা

অস্তিত্বের একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে অস্তিত্ববাদী দর্শনে। এ দর্শনে অস্তিত্ব বলতে বোঝায় ব্যক্তি মানুষের অলক্ষ ও সুপ্ত সম্ভাবনা। তাই, ব্যক্তিকে ঘিরে যে পরিবেশ বা বাস্তব জীবন বিদ্যমান, তা অনিত্য অস্তিত্ব। নিত্য অস্তিত্ব হলো ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনা। এ অস্তিত্বের মূলে রয়েছে কোনো এক রহস্যময় ব্যক্তি বা সত্তা। প্রতিনিয়ত যে ব্যক্তিরূপে আমরা জীবন যাপন করি, সে ব্যক্তি আসলে বাস্তব পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি।

আমরা এখন একথা জানি যে, অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল প্রশ্ন হলো মানুষের অস্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে ডেনমার্কের দার্শনিক কিয়েৰ্কেগার্দ হতে এ দর্শনের শুরু, একথাও আমরা জানি। তবে, ফরাসী দার্শনিক জঁ্যা-পল সার্ত পরবর্তী সময়ে এক নতুন ও সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যা ও রূপ দানে প্রয়াসী হন এ দর্শনকে। অস্তিত্ববাদীরা একথা জোর দিয়ে বলেন যে, ব্যক্তিসত্তা রূপে মানুষের একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে। তবে এ মতবাদের মাঝে যে বিশেষভাবে আত্মিকতা বা বিষয়ীত্ব (subjectivity) বিদ্যমান সে সম্পর্কে সার্ত সচেতন ছিলেন। আর সে কথা তিনি

'অস্তিত্ববাদ' ও 'মানবতাবাদ' গ্রন্থে উল্লেখও করেছেন। এবং বলেছেন কমিউনিস্টরা মনে করে, যেহেতু অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূলে দেকার্তের 'আমি চিন্তা করি' বক্তব্য কার্যকর, সেহেতু এ দর্শনের মধ্যেও রয়েছে এক ধরনের আত্মিকতা। একজন মানুষ যখন এ অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সে তার ব্যক্তিসত্তার বাইরে অন্য কোনো কিছুর সাথে সুষ্ঠু সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে না।

ব্যক্তিগত জীবনে কিয়েের্কেগার্দ ছিলেন অস্বাভাবিকরূপে আত্মিকতা-ক্রান্ত বা আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর এ ধরনের ব্যক্তিক জীবনের প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই যে তাঁর দর্শনে বিদ্যমান, তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে জগতে ব্যক্তির অস্তিত্বই প্রধান। ব্যক্তি তার ব্যক্তিক সত্তাকে প্রকাশ করে সংকটাপন্ন পরিবেশ বা অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। জীবন তার কাছে 'হয়/নয়' রূপে, সংকটজনকভাবে প্রতিভাত হয়। সর্বক্ষণ সে সংকটের মুখোমুখি হয়, তাকে কোনো না কোনো পক্ষ গ্রহণ করতেই হয়। এমনি সংকটের মোকাবেলার মাধ্যমেই ব্যক্তি তার অস্তিত্বে পরিচয় দিতে পারে, অস্তিত্বকে প্রকাশ করতে পারে, এবং নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে।

অস্তিত্ববাদী চিন্তায় বিদ্যমান আত্মিকতা সম্পর্কে সার্ত বলেছেন যে, অস্তিত্ববাদ একটা সত্যভিত্তিক মতবাদ, সত্যবর্জিত কোনো আকাশচারী চিন্তা বা সিদ্ধান্তের সমষ্টি নয়। তাঁর মতে সত্যকে একদিকে হতে হবে সহজলভ্য, অন্যদিকে হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবার, তা হবে কোনো বিষয়ে কারো প্রত্যক্ষজ্ঞান ভিত্তিক। এভাবে সচেতন হওয়া ও নিজেকে জানার মাঝে রয়েছে মানুষের মর্যাদাবোধ। কারণ এ সচেতনতা মানুষকে জড়বস্তু সম গণ্য করে না। কিন্তু সার্ত এখানে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, এ আত্ম-সচেতনতা ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ আত্মিকতার মতো নয়। অস্তিত্ববাদে যখন বলা হয় 'আমি

চিন্তা করি অতএব আমি অস্তিত্বশীল' তখন ব্যক্তি শুধু নিজের আমিত্বের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে শুধু নিজের সত্যাই উপলব্ধি করে না, বরং অন্যাদের আমিত্ব সম্পর্কেও সচেতন হয়। এ ক্ষেত্রে সে শুধু নিজেকেই আবিষ্কার করে না, সাধারণ সত্যকেও আবিষ্কার করে। কারণ, একক ব্যক্তিসত্তা অন্য ব্যক্তিসত্তা ছাড়া কিছুই করতে পারে না। কাজেই সে নিজের স্বরূপ জানতে গিয়ে অন্যদের স্বরূপও জানতে পারে। আবার অন্যদের মধ্যস্থতা এখানে অপরিহার্যও হয়ে পড়ে। কাজেই ব্যক্তিসত্তা নিজেকে খুঁজে পায় সমষ্টির মাঝে। এ অবস্থাকে বলা যেতে পারে আন্তর-আত্মিকতা। আমরা জানি এ প্রসঙ্গে সার্ত বলেছেন যে, সর্বজনীন মানবিক অবস্থা বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু সার্বিক মানব প্রকৃতি বলে কিছু নেই। মানুষের ঐতিহাসিক অবস্থান বিভিন্ন হতে পারে। একজন গরীব হয়ে, আবার একজন ধনী হয়ে জন্ম লাভ করতে পারে। কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে সবাই এক। আর সেগুলো হলো পৃথিবীতে অস্তিত্ব, কাজ ও মৃত্যু। এ বিষয়গুলো সব মানুষের ক্ষেত্রেই এক এবং অভিন্ন।

সার্ত সার্বিক সিদ্ধান্তগুলোকে বিষয়ীগত ও বিষয়গত হিসেবে দেখিয়েছেন। বিষয়গত হিসেবে এগুলোর সাথে সব মানুষের পরিচয় রয়েছে সব ক্ষেত্রেই এগুলোর সাথে মানুষের সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু বিষয়ীগত হিসেবে এগুলোর সম্পর্ক বিদ্যমান প্রতিটি সত্তার অস্তিত্বের অনুভূতির সঙ্গে। ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বের অনুভূতিতে না থাকলে এগুলো মূল্যহীন। এ বক্তব্যের মাধ্যমে সার্ত অবশ্য দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষের প্রতিটা উদ্দেশ্যের সামগ্রিক অবস্থা বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষের প্রতিটা উদ্দেশ্যের বিশিষ্টতা রয়েছে সত্য, কিন্তু এক ব্যক্তিসত্তার উদ্দেশ্য অন্য ব্যক্তিসত্তার উদ্দেশ্যের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়।

প্রত্যেক উদ্দেশ্যেরই সর্বজনীন মূল্য রয়েছে। একথার মাধ্যমে সার্ত ব্যক্তিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সর্বজনীন উদ্দেশ্যের কথা বলতে চেয়েছেন। যদিও তিনি আবার বলেছেন যে, সর্বজনীনতা পূর্ব হতে প্রদত্ত বা পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণার মতো কিছু নয়। এ সর্বজনীনতা মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে, স্বাধীন নির্বাচন বা বাছাই এবং পারস্পরিকভাবে একজন অন্যজনের উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত হওয়া কিংবা একজন অন্যজনকে বোঝা বা উপলব্ধি করার মাধ্যমে।

সার্ত বলেছেন, ব্যক্তিসত্তার দায়িত্ববোধ রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে। তার সিদ্ধান্ত শুধু নিজের জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য। ব্যক্তির যে কোনো কাজ সামগ্রিক কাজেরই অংশ। মানুষ পৃথিবীতে নিজেকে পায় পরিবেশ বা অবস্থাবলীর মাঝে। আর সে অবস্থাবলীর মাঝেই সে কোনো-না কোনো পথ বা মত আবিষ্কার করে যার সাথে সমগ্র মানব জাতিই জড়িয়ে পড়ে।

অনেকে অভিযোগ করেন যে, অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষ অন্যদের বিচার করতে বা অন্যদের কাজের মূল্যায়ন করতে পারে না। এ অভিযোগের উত্তরে অস্তিত্ববাদীরা বলেন যে, এ ধরনের সমালোচনা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন ব্যক্তি মানুষ কোনো কিছু বেছে নিয়ে নিজেকে অন্যদের চেয়ে ভালো মনে করে। কিন্তু যখন একজন মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়, নির্বাচন বা বাছাই করে, তখন সে একই সাথে নিজে এবং অন্যদের স্বাধীন ইচ্ছার কাছে সমানভাবেই দায়ী। তাই, নিজেকে বিচার করার সাথে সাথে সে অন্যদেরও বিচার করতে পারে।

হাইডেগারের মতে দার্শনিক বিচারের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো সত্তা। তিনি বলেন যে, আমি নিজেকে সত্তাবান পদার্থরূপে অনুভব করি। কিন্তু নিজেকে অনুভব করার সময়ে আমি সাক্ষাৎ অস্তিত্বকেই অনুভব করি। 'আমি' বলতে কখনো একটা নিকৃষ্ট সাধারণ

প্রত্যয় বুঝায় না। বরং আমি বলতে একটা সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বস্তু বুঝায়, এবং শুধু আমি শব্দ দ্বারাই অস্তিত্বের গোটা স্বরূপকে প্রকাশ করা যেতে পারে।

অস্তিত্ববাদী দর্শন অনুযায়ী মানুষের একটা মৌলিক অনুভূতি আছে, যা তার জীবনব্যাপী বিদ্যমান। হাইডেগার এর নাম দিয়েছেন বেদনা বা কষ্ট। তবে এখানে কষ্ট অর্থ ভয় নয়। বরং কষ্ট হতেই ভয় উদ্ভূত হয়। কিন্তু কষ্ট প্রথম হতেই সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ভয় হলো কষ্টের সেই অবস্থা, যা বিশিষ্ট কোনো বিষয় বা বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। ভয় আমাদের মৃত্যুর ভীতি দেখায়। আর সর্বপ্রকার কষ্ট প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু ভীতিরই কষ্ট। মৃত্যু হলো শেষ, শূন্যতা। এখানে আমরা হাই-ডেগারের দর্শনে একটা কঠিন অবস্থার ধারণা পাই, আর তাহলো শূন্যতার ধারণা।

অস্তিত্ববাদের মতে, আমরা যেন অস্তিত্বরূপ অবস্থার মধ্যে 'নিক্ষিপ্ত' হয়েছি। এ অবস্থায় আমাদের এ বিশিষ্ট অবস্থার স্বরূপ—আমরা কোথা হতে আসি, কোথায় যাই, এ সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। উভয় দিকেই আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ, উভয় দিকেই আমরা শূন্যের দিকে ফিরে আসি। এ শূন্যতাকে আমরা উপলব্ধি করি কষ্টের অনুভূতির মাঝে। হাইডেগার কষ্টকে আমাদের অস্তিত্বের একটা অপরিহার্য অঙ্গ রূপে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। আর তিনি কষ্টকে মূলত মৃত্যুর যাতনা বলেই বর্ণনা করেছেন।

ইয়েসপার্স বলেছেন যে, আমি সর্বপ্রকার বস্তুসত্তা হতে পৃথক। কারণ, আমি বলতে পারি 'আমি আছি'। আমি কোনো-না কোনোভাবে অবশ্যই আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারি বা হই। নিজের সংকল্প ও ইচ্ছার মধ্যে এবং আমার অবচেতন ক্রিয়ার মাঝে আমি

আমার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করি। আর এ সব মূলত আমার মধ্য হতেই উৎসারিত।

ইয়েসপার্স অস্তিত্ব বা স্বাধীন আত্মাকে ইচ্ছাশক্তির সাথে অভিন্ন বলে মনে করতেন। যে ক্রিয়া ও ইচ্ছা সৃজনশীল, স্বাধীন ও মৌলিক; তার মাধ্যমেই আমরা আত্মাকে জানি ও উপলব্ধি করি। আর যে অনুভূতিতে আমি নিজের মাঝেই অবস্থিত, তার আত্মপ্রকাশের মধ্যে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর তা হলো বাহ্যজগতের পশ্চাতে বিশুদ্ধ অস্তিত্বরূপে 'আমি আছি' অনুভূতি বিদ্যমান। এসব কিছুই হলো অস্তিত্ববাদীদের আত্মিক চিন্তার ফসল।

অস্তিত্ববাদী স্বাধীনতা

অস্তিত্ববাদী দর্শনে স্বাধীনতার প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অস্তিত্ব-বাদীরা 'স্বাধীনতা'কে শুধু ব্যাখ্যা করে কর্তব্য সমাপণ করতে চান না। তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা, যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, সে সব ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করতে, স্বাধীনতাকে ধারণ করতে, স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে এবং স্বাধীনতাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতেও স্বাধীন।

আমরা আগেই দেখেছি যে, যেসব দার্শনিককে সাধারণভাবে অস্তিত্ববাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাদের সবার বক্তব্য এক নয়। ঠিক তেমনিভাবে স্বাধীনতা, অস্তিত্ববাদী স্বাধীনতা সম্পর্কেও তাঁরা সবাই এক মত নন। কিয়ের্কেগার্দের কাছে স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, তিনি মনে করতেন যে, স্বাধীনতার উৎস ঈশ্বর। ঈশ্বরই পৃথিবীতে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। মানুষ যদি এ স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিতে ও রক্ষা করতে চায় তাহলে তার দায়িত্ব হলো শর্তহীনভাবে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

আর মানুষ যদি তাই না করে, তাহলে তার কাছে এ স্বাধীনতা হবে অর্থহীন, এবং শেষ পর্যন্ত সে স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে ব্যর্থ।

কিয়েৰ্কেগার্দের মতে, মানুষ তখনই স্বাধীনভাবে নির্বাচন করে, যখন সে ঈশ্বরকে নির্বাচন করে। আর তখনই সে ঈশ্বরকে নির্বাচন করে, যখন সে খ্রীস্টান ধর্মকে নির্বাচন করে। আর, তখনই সে খ্রীস্টান ধর্মকে নির্বাচন করে, যখন সে খ্রীস্টান হবার, ভালো খ্রীস্টান হবার জন্যে খ্রীস্টান ধর্মের ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। কারণ ঈশ্বর মানুষকে যে স্বাধীনতাটুকু দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাহলো, ভালো খ্রীস্টান হবার স্বাধীনতা। অতএব, কিয়েৰ্কেগার্দের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর মতে মানুষ আসলে স্বাধীন নয়। বরং মানুষ 'নাচের পুতুল'। তাকে শুধু ভালো খ্রীস্টান হবার স্বাধীনতাই দেয়া হয়েছে। ভালো খ্রীস্টান হওয়াই তার কাছে স্বাধীনতা। সে যদি ভালো খ্রীস্টান হতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে তো স্বাধীন নয়ই, বরং সে যথার্থ অর্থে অস্তিত্বশীলও নয়।

স্বাধীনতা সম্পর্কিত নীটশের বক্তব্যও বিভ্রান্তির পরিচায়ক। তাঁর দর্শন ব্যাখ্যা করলে বুঝা যায়, সেখানে ঈশ্বর নেই। কিন্তু ঈশ্বর-বিহীন পৃথিবীতে রয়েছে এক ধরনের চরম শক্তির অধিকারীর মানব, শ্রেষ্ঠ মানব। যে শ্রেষ্ঠ মানব নীটশের দর্শনে ঈশ্বরের আসনে বসে আছেন। এ অতি মানবই শাসন করবে সাধারণ মানুষকে। অতি মানবের কাছে সাধারণ মানুষ যেন একইরূপ 'নাচের পুতুল'। কারণ অতি মানবের নীতি ও নির্দেশ সাধারণ মানুষ যেন মেনে চলতে বাধ্য। তাই যদি হয়, তাহলে নীটশের দর্শনেও যথার্থ স্বাধীনতা অনুপস্থিত।

একমাত্র হাইডেগারই যথার্থ ব্যক্তিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে মানুষ প্রবহমান অস্তিত্বের অধিকারী। তাকে কোনোভাবেই গতিহীন বিষয়ের মতো সংজ্ঞায়িত করা বা বিশেষিত করা যায় না। মানবসত্তা অফুরন্ত সম্ভাবনা ও পরিবর্তনশীলতার আধার। তাই, নিজ পছন্দ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন এবং নিজেই নিজের অস্তিত্বের নির্ধারক। যদিও, তার জন্মগত অবস্থা ও অবস্থানের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন নয়। এগুলো মানুষের স্বাধীনতাকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। তবে, এ সীমিত অবস্থা মেনে নিয়েও মানুষ স্বাধীন।

লক্ষ্যণীয় যে, হাইডেগার স্বাধীনতার বাস্তব বা বিষয়গত সীমা-বদ্ধতা স্বীকার করেছেন এবং তার ভিত্তিতেই মানুষের স্বাধীনতাকে বিচার করেছেন। অর্থাৎ তিনি স্বাধীনতাকে বিবেচনা করেছেন বিষয়গত ও বিষয়ীগত অবস্থার সমন্বয়ের ভিত্তিতে। সে ভিত্তিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র হাইডেগারের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বক্তব্যই যথার্থ, তথা যৌক্তিক ভিত্তি সম্পন্ন। তিনি স্বাধীনতার বিষয়গত ও বিষয়ীগত দিক বিবেচনা করে, দু'য়ের মাঝে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক নির্ধারণের প্রতি যত্নশীল ছিলেন।

ইয়েসপার্স স্বাধীনতার তথা মানব অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছেন বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান মারমুখী রূপকে। এবং তিনিও এ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাঝে আশা করেছেন স্বাধীনতার মূর্ত রূপ লাভের সম্ভাবনায়। তিনি বলেছেন যে, আত্মসচেতন মানুষই একমাত্র অস্তিত্বশীল। তাই এ অফুরন্ত সম্ভাবনার আধার মানুষ যদি সচেতনভাবে তার অস্তিত্বশীলতাকে সদ্ব্যবহার করে, তাহলেই সে যথার্থ অর্থে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে, অস্তিত্বশীল হতে পারে।

সার্ত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বক্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি 'স্বাধীনতা'কে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে স্বাধীনতার অর্থ হলো, 'ইচ্ছা করা, সিদ্ধান্ত নেয়া'। ইচ্ছা করার পর সেক্ষেত্রে সফলতা আসবে কি-না, সে প্রশ্ন তাঁর কাছে বড় নয়, ববং কোনো কিছু করার ইচ্ছে করা, কোনো কিছু করার জন্য নির্বাচন করাই হলো আসল স্বাধীনতা। সাধারণভাবে একজন মানুষ কোনো কিছু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো, এবং করতে ব্যর্থ হলো। এক্ষেত্রে আমরা তার ব্যর্থতা-কেই বড় করে দেখবো। কিন্তু সার্ত্রের কথা হলো সফলতা বা ব্যর্থতা স্বাধীনতার প্রশ্নে বড় নয়। বরং কাজ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করা, এবং সচেতনভাবে কাজ করতে প্রয়াসী হওয়াই আসলে স্বাধীনতা।

তিনি আরো বলেন যে, কোনো কাজে সফলতা আসার পরও সে কাজ স্বাধীনতার পরিচায়ক না-হতে পারে। যদি-না ব্যক্তি সচেতন-ভাবে কাজ করার পূর্বে সে কাজ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে থাকেন। কারণ, ব্যক্তিকে একমাত্র সচেতন কাজের জন্যই বিচার বিবেচনার মাঝে আনা চলে। অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তি কি-করলো, সেজন্য তাকে বিবেচনা করা যাবে না। তিনি একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়-টাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বা অন্যমনস্কভাবে একটা জ্বলন্ত সিগারেটের শেষ অংশ ফেলে দেয় এবং তার ফলে কোনো কারখানায় আগুন ধরে, তাহলে এজন্য সে ব্যক্তিকে দায়ী করা যাবে না। কারণ, তিনি সচেতনভাবে এ কাজ করেন নি বলে তাকে তার 'কর্ম' বলে অভিহিত করা যাবে না। আর অসচেতন কাজ বা ক্রিয়াকে কর্মের সাথে প্রকার্থবোধক রূপে বিবেচনাও করা যাবে না। কারণ, কর্ম উদ্দেশ্য সূচক। কিন্তু অসচেতন ক্রিয়া কোনোরূপ উদ্দেশ্য সূচক নয়। অন্যদিকে কর্মের সাথে যেহেতু উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়

জড়িত, সেহেতু তা আবার অভাববোধকও। অভিপ্রায় অভাববোধ থেকেই উদ্ভূত। অন্যদিকে, অভিপ্রায় মানেই হলো 'আমি এখনও যা নই, তা হতে পারার প্রত্যাশা'। এ বিশ্বই আমার কর্মক্ষেত্র। আর কর্ম আবার আমার ভবিষ্যতকে সূচিত করে। তাই সার্তের মতে, 'কর্ম হলো যা নয়, তার প্রতি স্বহেতু-সত্তার অভিক্ষেপ'। আবার কর্ম করার অর্থই হলো বিশ্বের বর্তমান স্বরূপকে পরিবর্তিত করা। তাই সার্তের মতানুসারে সচেতন কর্মই হলো স্বাধীনতা।

সার্তের মতে মানুষ কোনো কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং সে-ই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সব স্বাধীন কর্ম মানুষের ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়। আর, এ স্বাধীন কর্ম ও ইচ্ছা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সার্ত আরো বলেন, মানুষের প্রতিটা অভিপ্রায়ই মূল্যবান। কারণ মানষ প্রতিটা কর্মের অভিপ্রায়কে মূল্যায়ন করে ও মূল্যদান করে। তবে, এ অভিপ্রায় কিন্তু মানুষের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এ প্রসঙ্গে সার্ত বলেন আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, অভিপ্রায় আমাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে আমরা নিয়ন্ত্রণবাদী হয়ে যাবো। কিন্তু তা ঠিক নয়। তিনি আরো বলেন যে, আমরা মানুষই কর্মের কারণ। স্বাধীন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যকে আমরাই অর্থবহ করে তুলি। আমরা শুধু কাজ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুতই হই না, বরং কর্মের কারণে আমরাই উদ্দেশ্য নির্বাচন করি, স্থির করি ও তাকে মূল্যায়ন করে অর্থপূর্ণ করে তুলি।

সার্ত বলেন, এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতাই হলো মূল কথা, কর্মের কারণ এবং উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের ভিত্তি। তবে, এসব যদি ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে তা স্বাধীনতার ভিত্তি হবে না, বরং স্বাধীনতার অধীন হবে। দেকার্ত বলেছিলেন, 'মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন হলেও আত্মার ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত'। দেকার্তের বক্তব্যের মাঝে সার্ত লক্ষ্য

করেন এক ধরনের স্ববিরোধী মত। তাই এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মানুষ একদিকে স্বাধীন, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত, দু'রকম প্রকৃতির অধিকারী হতে পারে না। এর পর সার্ত এ বিষয়ক নিজের মত প্রকাশ করে বলেন যে, মানুষ স্বাধীন। মানুষ শুধু অভিপ্রায় প্রকাশ করতেই স্বাধীন নয়, সে ভাবাবেগ অগ্রাহ্য করতেও স্বাধীন। আবার যে কোনো অবস্থায় মানুষ ভাবাবেগকে অস্বীকার করতেও স্বাধীন। ধরা যাক, একজন মানুষ স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে গিয়ে কোনোরকম প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হলো। প্রতিক্রিয়া দারুণভাবে তাকে আক্রমণ করলো। এমনি অবস্থায় সে ব্যক্তি ভীত হয়ে গৃহীত পথ পরিত্যাগ করতে পারে, কিংবা আরো দৃঢ় মনোবলের সাথে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সক্রিয় হতে পারে। সে ভেঙে পড়তে পারে, কিংবা সংগ্রামী মনোবলের অধিকারী হতে পারে। এমনি পরিবেশে সে ভীত হয়ে প্রতিরোধের পথ পরিত্যাগ করলেও স্বাধীন, আবার দৃঢ়তার সাথে প্রতিক্রিয়াকে প্রতিরোধ করলেও স্বাধীন। সে ভীত হলে তাতে ভাবাবেগ জড়িত থাকবে। সে অবস্থায়ও সে স্বাধীন। তার সাহসী হওয়ার যেমন স্বাধীনতা রয়েছে, তেমনি ভীত হবারও স্বাধীনতা রয়েছে। সে যাই করুক না কেন স্বাধীনভাবেই করে। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে স্বাধীন। স্বাধীন না হবার কোন স্বাধীনতা তার নেই।

আসল কথা হলো, মানুষ যা-ই করুক না কেন, সে যদি কোনো কিছু অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে করে, তাহলেই সে স্বাধীন। কারণ মানুষের অস্তিত্বশীল হবার অর্থই হলো কোনো কিছু করার অভিপ্রায় প্রকাশ করা, নির্বাচন করা। তবে, তার মানে এই নয় যে, যাচ্ছে তাই করা। দস্তয়েভস্কি বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা হলো খামখেয়ালীপনা'। কিন্তু সার্ত এ মত তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে,

স্বাধীন মানে 'নির্বাচনের স্ব-শাসন'। তিনি আরো বলেন যে, সাধারণ-ভাবে বস্তু মূল্যহীন। কিন্তু আমাদের স্বাধীন নির্বাচনের প্রেক্ষিতেই বস্তু মূল্য লাভ করে। আমরা আমাদের পরিকল্পনার ভিত্তিতেই বস্তুর ওপর মূল্য আরোপ করি। ধরা যাক একটা বট গাছ। বট গাছ সাধারণভাবে থাকে। সে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু একজন ধ্যানীর কাছে বট গাছটা মূল্য লাভ করে এক অর্থে। আবার একজন কাঠ বিক্রেতার কাছে একই বটগাছ মূল্য লাভ করে অন্য অর্থে। কিন্তু, এ বট গাছটা যদি ধ্যানী বা কাঠ বিক্রেতা, কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, তা হলে তা অবশ্যই মূল্যহীন।

সার্ত মানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এমন কি যেসব বাস্তব অবস্থা মানুষের স্বাধীনতাকে সীমিত করে, মানুষের বিষয়ীগত চেতনার ক্ষেত্রে সে সব কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ ব্যক্তির স্বাধীনতার বাস্তব প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকার করে নিয়ে ব্যক্তি যদি তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তাহলেই সে স্বাধীন। স্বাধীনতা মানব প্রকৃতির মাঝে বিদ্যমান কোনো অধিবিদ্যক ধারণা যেমনি নয়, তেমনি যাচ্ছে-তাই করার ছাড়পত্রও নয়। তবু, আমরা স্বেচ্ছায় যা করি, বর্তমানে আমরা যা আসলে আমরা তা-ই।

সার্তের ব্যক্তি যে সমাজ-বিচ্ছিন্ন, সার্ত তা স্বীকার করেন না। কারণ, তাঁর ব্যক্তিকে তিনি বলেছেন সামাজিক ব্যক্তি, সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তি। আর, ব্যক্তি যেহেতু সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়, সেহেতু সমাজে ব্যক্তির কিছু-না-কিছু ভূমিকা রয়েছে। আর এ ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার স্বাধীনতাকে যথার্থ অর্থে প্রকাশ করতে পারে। তার সমাজে ভূমিকা পালন করতে গিয়েই ব্যক্তি কোনো না কোনো বিঘ্নের সম্মুখীন হয়। এ ধরনের বিঘ্নের মাঝে ব্যক্তি যদি যথাথ অর্থে নিজের অভিপ্রায়কে বাস্তব রূপ দিতে প্রত্যাশী

হতে পারে, তাহলেই তার অবস্থান হয় যথার্থ। এমনি অবস্থায় স্বাধীনতাও হয় অর্থপূর্ণ। আর সে কারণেই সার্ত বলেছেন যে, বাস্তব অবস্থার মাঝেই স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ এবং স্বাধীনতার মাঝেই বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি।

আমরা জানি, অস্তিত্ববাদ সার্তীয় অস্তিত্ববাদ আত্মিকতার দর্শন। এ দর্শনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তা-ই আত্মিকতা। কিন্তু যে সার্ত নিজেকে মানবতাবাদী বলে পরিচয় দিতে চেয়েছেন, যিনি বলেছেন যে, তাঁর অস্তিত্ববাদ মার্কসীয় দর্শনের ছত্রছায়ায় এক ধরনের ভাবাদর্শ। তাঁর দর্শনের পদ্ধতি যেন অধিক আত্মিকতা কবলিত। তিনি স্বাধীনতার বাস্তব সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করে সম্ভবত অধিক আত্মিকতার কাছেই নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন। ফলে তার স্বাধীনতাও এক ধরনের আত্মিক স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। সম্ভবত সে কারণেই স্বাধীনতা সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্যকে তিনি যথার্থ যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করতে পারেন নি। অবশ্য তারও বাস্তব কারণ বিদ্যমান। আর তা হলো পদ্ধতিগত দুর্বলতা। সার্তের পদ্ধতি আত্মিকতার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে যৌক্তিকতা অনুপস্থিত না-হলেও, যথার্থ অর্থে উপস্থিত নেই। তাই, যৌক্তিক ভিত্তির অভাবে, এবং আত্মিকতার প্রভাবে সার্তীয় স্বাধীনতার প্রত্যয় বার্কলির আত্মিকতার সমতুল্য না-হলেও, একই শ্রেণীভুক্ত। তাই এ ধরনের আত্মিকতা কবলিত চিন্তা কখনোই যথার্থ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না। বরং মানুষের মাঝে হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা বোধাক্রান্ত বিদ্রোহ ছড়িয়ে, শেষ বিচারে ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়ার সহায়তা করে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও। আমাদের দেশ, উপমহাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সফলতা-ব্যর্থতার ধারা পর্যালোচনা করলে একথার যথার্থতাই প্রমাণিত হয়।

অস্তিত্ববাদ ঃ সাহিত্যে

দর্শনকে যতই গণমানুষের বোধগম্য করার প্রয়াস নেয়া হোক-না-কেন, যতই জীবন-দর্শনের চেষ্টা করা হোক-না-কেন, কিংবা বা শ্রমজীবীর তথা সর্বহারা শ্রেণীর দর্শন চর্চা করা হোক না কেন, আসলে অন্তত শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সাধারণ মানুষের কাছে দর্শনকে বোধগম্য করে প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়। কারণ জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার মতো দর্শনেরও কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিয়ম-নীতি রয়েছে, যা না জানলে যথার্থ অর্থে দর্শন কারও কাছে বোধগম্য হয় না। তবে একেবারেই সম্ভব না, একথা বলা ঠিক নয়। সহজভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে না-হলেও, সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকে ব্যবহার করে। যেহেতু সাহিত্য অতি সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য, সেহেতু দর্শনের তুলনায় সাধারণ মানুষ সাহিত্যের মাধ্যমেই দার্শনিক তত্ত্বকে অনুধাবন করতে সক্ষম হন। সে কারণেই, শুধু দর্শনানুরাগী সাহিত্যিকরাই নন, অনেক প্রখ্যাত দার্শনিকও নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশের ও প্রচারের জন্য মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন সাহিত্যকে। প্রখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্ত এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

আমাদের এ পর্বের আলোচ্য বিষয় 'অস্তিত্ববাদ : সাহিত্যে', অর্থাৎ সাহিত্যে অস্তিত্ববাদ। এ প্রসঙ্গে আমরা শুধু অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের সাহিত্যই আলোচনা করবো না, বরং যে সব সাহিত্যিকের চিন্তা-

ধারার মাঝে স্পষ্টভাবে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়, তাদের প্রসঙ্গও আলোচনা করবো। উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্যের অনেক আধুনিক গাল্পিক, ঔপন্যাসিক ও কবির সাহিত্যচিন্তার মাঝে অস্তিত্ববাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, তাদের সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলতে গেলে গবেষণা করা প্রয়োজন। তাই, তাদের প্রসঙ্গে ভিন্ন ও ব্যাপক আলোচনাও আবশ্যক। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাদের প্রসঙ্গ না এনে, বিশ্বসাহিত্যের কয়েকজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের এবং জঁ্যা-পল সার্ত্রের সাহিত্যকর্মের আলোচনার মাঝে এ প্রসঙ্গ সীমাবদ্ধ রাখবো।

প্রাথমিকভাবে যাদের সাহিত্যে আমরা অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করি, তারা হলেন রুশীয় ঔপন্যাসিক তলস্তয় ও তুর্গেনেভ। তলস্তয়ের 'ডেথ অব ইভান ইলিচ' উপন্যাসের মাঝে অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর এ প্রখ্যাত লেখকের লেখার মাঝে পুঁজিবাদী অত্যাচার ও কৃষকদের দুর্দশার কাহিনী স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তার চিন্তাধারার মাঝে খ্রীস্টধর্ম, কনুফসীয় চিন্তাধারা ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তার 'ওয়ার এণ্ড পিস', 'রিজারেকশন', 'আনাকেরেনীনা' প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ। ঔপন্যাসিক তুর্গেনেভের 'ফাদারস এণ্ড সন্স-এর মাঝে অস্তিত্ববাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'শিকারীর নক্সা', 'রুদিন', 'প্রাক্কালীন', বাবুদের বাসা', 'পিতাপুত্র', 'কুমারী মৃত্তিকা' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রুশীয় ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কির সাহিত্যের মাঝেই অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। বলা চলে সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী চিন্তা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে আত্মিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ অস্তিত্ববাদী চিন্তার জন্য আবশ্যক, তা যথার্থভাবেই দস্তয়েভস্কির সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়।

দস্তয়েভস্কির গ্রন্থগুলোর মাঝে 'দ্য ল্যাণ্ডলেডী', 'হোয়াইট নাইটস', 'দ্য হাউস অব দ্য ডেড', 'দ্য ইডিয়ড', 'দ্য পজেজড', 'দ্য ইটারনাল হাজব্যাণ্ড', 'দ্য ব্রাদার কারামোজোভ', 'নোটস্ ফ্রম দ্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড' এবং 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট' উল্লেখযোগ্য।

অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দস্তয়েভস্কি সর্বদাই ছিলেন প্রতিবাদ-মুখর। তার সব রচনার মাঝেই এ প্রতিবাদমুখরতা লক্ষণীয়। তার 'নোটস্ ফ্রম দ্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড' এবং 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট'-এর মাঝে এ প্রতিবাদকে অস্তিত্ববাদী চিন্তার মূর্ত প্রকাশ রূপেই দেখতে পাওয়া যায়। ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট-এর নায়ক রাসকলনিখভের তীব্র প্রতিবাদ লক্ষণীয় বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে কোন মূল্যবোধই মানে না। সে এ ধরনের মানসিকতায় ক্ষত-বিক্ষত।

দস্তয়েভস্কির মতে, নিঃস্বার্থ ভালবাসা কিংবা সৃজনশীল কর্ম-কাণ্ডের তুলনায় স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে নির্বাচন যে কোন অস্তিত্ববাদীর কাছে অধিক মূল্যবান। কারণ তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতায় অধিক বিশ্বাসী ছিলেন। আর সে কারণেই তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের স্বনিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে। তিনি বলতেন, স্বাধীন নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক না কেন, এর পরিণতিতে মানুষ যেখানেই গিয়ে পৌঁছুকনা কেন, মানুষ সব সময়ই স্বনিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের প্রত্যাশা করে এবং এর মাঝেই মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীন নির্বাচন, নিরঙ্কুশ খামখেয়ালী ও আত্মকল্পনা বা আত্মিকতার মাঝেই প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্যের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আর এ স্বাতন্ত্র্যই প্রত্যেক মানুষের চরম স্বাধিকার।

শেক্সপীয়র এবং কাফকা-এর সাহিত্যকর্মের মাঝেও আমরা লক্ষ্য করি অস্তিত্ববাদের প্রভাব। উভয়েই এ বিশ্বকে অভিহিত করেছেন বন্দী-

শালা বলে। উভয়েই মানব পরিস্থিতির মাঝে বিদ্যমান নিষ্ঠুরতা, অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। উভয়েই এ বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি কামনা করেছেন। তবে শেক্সপীয়রের উপর এর প্রভাব খুবই সামান্য। কিন্তু কাফকা গভীরভাবে অস্তিত্ববাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত দু'জনের মুক্তি সম্পর্কিত ধারণার মাঝে গভীর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

কাফকার মতে মানুষ অনন্ত সম্ভাবনাময়, সে সব সময়ই অপূর্ণ। এবং মানুষের বিদ্যমান অস্তিত্ব অস্থায়ী, তথা ক্ষণিক। এমনকি জগত ও জীবন, সবকিছুই অস্থায়ী। অন্যদিকে কাফকার মতে, সত্য বিষয়-গত নয়, বিষয়ীগত। আত্মিকতার মাঝেই নিহিত সত্যতা, বাস্তবতার মাঝে কোন সত্যতাই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তবতার মাঝে কোন সত্য নিহিত থাকলে, তাকেও অনুধাবন করতে হবে আত্মিকতা দিয়ে।

অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিকদের মাঝে কাফকা অন্যতমই নন; উল্লেখ-যোগ্য অন্যতম। তিনি তার 'দ্য ট্রায়াল' গ্রন্থে অতি নিপুণভাবে অস্তিত্ব-বাদী দর্শনের পরিত্যক্ততার ধারণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দ্য ক্যাসেল' গ্রন্থেও তিনি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন অস্তিত্ববাদী দর্শনের 'সিদ্ধান্তহীনতা' ও 'শূন্যতা'র ধারণাকে। মানবজীবনের একাকীত্ব, নিসঙ্গতা দ্বন্দ্ব, অর্থহীনতা ইত্যাদি প্রত্যয়গুলো তিনি সুন্দরভাবে তার উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন।

সাম্প্রতিক কালের আরেকজন বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিক কাম্যু। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কাম্যু তার দার্শনিক রচনা এবং গল্প, উপন্যাস ও নাটকের মাধ্যমে স্বীয় উজ্জ্বল প্রতিভাকে প্রকাশ করেছেন। প্রচলিত অর্থে তিনি দার্শনিক ছিলেন না। তবুও তার রচনার মাঝে লক্ষ্য করা যায় মানব অস্তিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ—জীবন ও জগতের অসঙ্গতি, অস্থায়িত্ব, অনিশ্চয়তা, বেদনা, নৈরাশ্য, অবসাদ, মনস্তাপ,

শংকা, আত্মবিচ্যুতি বা বিচ্ছিন্নতা ও মৃত্যু চিন্তা। এসব কারণে তাকে অবশ্যই অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিক বলা চলে। যদিও তিনি নিজে এ ধরনের বিশিষ্টতার ভিত্তিতে নিজেকে চিহ্নিত করতে চাইতেন না।

জন্মের এক বছর পরই কাম্যু পিতৃহারা হন। তার শৈশব ও কৈশোর কাটে দারুণ দারিদ্রের মাঝে। শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন পুরো ফরাসী। কিন্তু জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ইউরোপীয়। অন্যদিকে তার জীবনের দীর্ঘ সময় কাটে আলজেরীয় ও আরবীয় জনসাধারণের সাথে।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি মারলো পাঠ করেন। আর ২৮ বছর বয়সেই প্রকাশিত হয় তার 'ক্যালিগুলো' নাটক, 'দ্য স্ট্রেঞ্জার' উপন্যাস এবং 'দ্য মিথ অব সিসিফাস' নামক দার্শনিক গ্রন্থ। এসব রচনা তাকে বিশ্ব সাহিত্যের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে।

অর্থকষ্টের কারণে ছাত্রজীবনে কাম্যু সেলসম্যান ও করনিকের কাজ করেছিলেন। দ্য স্ট্রেঞ্জারের মাঝে চিত্রিত করনিকের চরিত্র সম্ভবত তার সে জীবনেরই প্রতিফলন।

প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিলেন কাম্যু। তিনি ফ্যাসী-বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার মাধ্যমেই রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। এর পর ১৯৩৪ সালে তিনি সদস্য পদ লাভ করেন কমিউনিস্ট পার্টির। এক পর্যায়ে পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু বেশী দিন যেতে না যেতেই ১৯৩৭ সালে তিনি ত্যাগ করেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ।

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তার মূল বক্তব্য ছিল জীবনের অসম্ভাব্যতা বিষয়ক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জীবন মূলত অসম্ভাব্যতা। যুক্তি এর অতল গহ্বরকে আলোকিত করতে পারে না। এ জগত ও জীবন

সঙ্গতিহীন, যৌক্তিকতাহীন, অর্থহীন এবং স্ববিরোধিতাপূর্ণ। যদিও এ সব কিছু সাহসের সাথে স্বীকার করেই আমাদের দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কারণ, উপরোক্ত সমস্যাগুলো থেকে অসঙ্গতির জন্য হলেও, মানুষ সে পরিবেশ থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। জীবনের যান্ত্রিকতা, নি:সঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত বোধ বা অনুভূতি থেকেই জন্মলাভ করে নানাবিধ অসঙ্গতিবোধ। যদিও, এ অবস্থায় আত্মহত্যা করে জীবন থেকে শুধু পালানো সম্ভব। কিন্তু প্রয়োজন আত্মহত্যার মুখোমুখি হওয়া, বিদ্রোহ করা। কারণ, বিদ্রোহই মানব জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। আত্মহত্যা দ্বারা কোন রকম বিদ্রোহ করা সম্ভব নয়। বরং তা অবিচারকে মেনে নেয়, তাকে প্রবল হবার পথ করে দেয়। তাই, এ ধরনের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে অন্তত: বেঁচে থাকাও প্রকারান্তরে বিদ্রোহ করা। আর যথার্থ বিদ্রোহই মানব জীবনকে উদ্ভাসিত করে, মানুষের অস্তিত্বশীলতাকে প্রকাশ করে।

'দ্য রেবেল'-এ তিনি বিদ্রোহেরই জয়গান করেছেন। তবে, 'দ্য মিথ অব সিসিফাস'-এ তার যে বিদ্রোহের কথা প্রকাশিত হয়েছে, তা একান্তই ব্যক্তিগত। তিনি অন্যায়-অবিচারের বিরোধী ছিলেন। তাই এ সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই প্রকাশিত হয়েছে তার রচনায়। তবে, আস্তিকতায় বিশ্বাসী, অস্তিত্ববাদী কামু্য সহানুভূতিপ্রবণ ছিলেন। তাই, কোন আদর্শের নামেও কোনরূপ অত্যাচারকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সম্ভবত এ কারনেই তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের মাঝে বিদ্যমান একান্ত প্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতার কারণে, কমিউনিজমকে ফ্যাসিজমের প্রকারভেদ বলেই মনে করতেন।

সাধারণভাবে তিনি ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ বিদ্রোহী। তিনি অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এত অনুভূতিশীল ও বিদ্রোহী ছিলেন বলেই তার 'ক্রস পারপাস' নাটকে মার্থার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, কারো

দুঃখ কখনোই মানুষের প্রতি অন্যায়-অবিচারের সমতুল্য হতে পারে না। আবার তিনি 'দা জাস্ট' নাটকে পরোক্ষভাবে নিজেই বলেছেন যে, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও হিংসা ব্যবহার করা যায় না, হিংসার পথ বেছে নেয়া যায় না।

তিনি বিশ্বাস করতেন, বর্তমান বিশ্বে যে সুবিচার নির্বাসিত হয়েছে, সহমর্মিতা বিদায় নিয়েছে, এ অবস্থা যদি দূর করা সম্ভব হয়, তাহলে তা একমাত্র মিতাচার ও সংযমের ভিত্তিতে সম্ভব। যুক্তি এ অসঙ্গত ও অর্থহীন মানবজীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারে না। মানব জীবন নিঃশেষে নৈরাশ্য ও দুঃখ দমনের প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

'দা প্লেগ' গ্রন্থেও হিংসা বিরোধী বক্তব্য প্রচার করেছেন। এখানে তিনি মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচারে প্রয়াসী ছিলেন। 'প্লেগ' বলতে তিনি মানুষের অসঙ্গত অবস্থা ও হানাদার নাৎসী বাহিনীকে এবং সর্বোপরি মানুষের হানাহানিকে বুঝিয়েছেন। কারণ, এ সবকে তিনি মহামারী তুল্যই ভেবেছেন।

লক্ষ্যণীয় যে, কামু্য বিদ্রোহী ছিলেন। বিদ্রোহী ছিলেন অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের প্রতি। কিন্তু তিনি এ বিদ্রোহকে যথার্থ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ 'হিংসার বদলে হিংসা'কে পরিহার করার পক্ষপাতি ছিলেন, নিঃশর্তভাবে। এক্ষেত্রে তিনি বোধ হয় বিদ্রোহের যথার্থ পদ্ধতি তথা দ্বান্দ্বিকতাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

অস্তিত্ববাদী সাহিত্যেও সার্ত্রের স্থান অগ্রগণ্য। তার প্রথম উপন্যাস Nasuea বা বিবমিষায় স্বীয় অস্তিত্ব চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এ উপন্যাসের নায়ক রকেন্টিন প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে মোহমুক্ত। চোখে তার চারপাশের জগত অশ্লীল, কদাকার ও

পিচ্ছিন্ন। প্রচলিত পারিবারিক সম্পর্ক ও নারী প্রেমেও তার ছিলো গভীর অনাস্থা। তিনি মনে করতেন যে, নারী প্রেম আসলে দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর একটা প্রক্রিয়া বা উপায় মাত্র। তাই এ সবের প্রতি তার ঘটেছিলো মোহমুক্তি। যদিও তার জীবন নৈরাশ্যাক্রান্ত। সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে রকেন্টিন শেষ পর্যন্ত মানসিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি পায় শিল্পকলার মাধ্যমে সংগতিময় ও নিয়মনিষ্ঠ বিশ্ব গড়ে তোলার অনুভবের ভিত্তিতে।

'দ্য এজ অব রিজন', 'রিপ্রীভ' ও 'আয়রন ইন দ্য সোল' নিয়ে সার্তের ত্রয়ী উপন্যাসমালা 'দ্য রোডস টু ফ্রিডম'। এ ত্রয়ীতে সার্ত স্বকীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন তীব্র স্বদেশপ্রেম ও বলিষ্ঠ সংগ্রামের বক্তব্য। এতে তিনি অস্তিত্বের সংকট, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়কে চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন। এ ত্রয়ীর মূল নায়ক ম্যাথু। শৃংখলিত ও দর্শনের শিক্ষক ম্যাথু যেন সার্তেরই প্রতিকৃতি।

ম্যাথুর কাছে মৃত্যু ভীষণ কিছু নয়। কারণ তিনি দায়িত্ববোধে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই তার কাছে শান্তির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো জাতীয় প্রয়োজনে যুদ্ধ। তার মতে জন্মলাভ করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাই বলে মৃত্যুকে ভয় করলে চলবে না। বরং দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে সক্রিয়ভাবে। এ বিশ্বাসে বলীয়ান বলেই ম্যাথু নির্দ্বিধায় নাম লিখিয়ে আসে স্বদেশের হয়ে আগ্রাসী জার্মানীর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে। এভাবেই এ উপন্যাসের নায়ক স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন স্বীয় অস্তিত্বকে। ম্যাথু ও তার সাথীদের নিয়ে সার্ত জীবনের সুখ-দুখ-হাসি-কান্নার চিত্র তুলে ধরেছেন। এবং এর শেষ পরিণতিতে সার্ত ফরাসীদেশের পতন, ফরাসীবাসীদের চিন্তা-ভাবনা-আবেগ-অনুভতি-ইচ্ছার মাধ্যমে পরাজয়ের প্রচলিত তাৎপর্যই বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সংকটময় মুহূর্তেই মানুষ তার

প্রকৃত স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। মূল কথা হলো, তিনি এখানে স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধের ধারণাকে সমন্বিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

'দ্য ফ্লাইজ' নাটকে সার্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা বলেছেন, গ্রীক পুরাকাহিনীর নবভাষ্য প্রদানের মাধ্যমে। 'নো এক্সিট'ও পৌরুষ ও বীরত্বের প্রতীক। 'দ্য ওয়াল'-এ মৃত্যুর স্বকীয় অবস্থা উপস্থাপিত। 'দ্য রুম', 'ইনটিমেসী', 'দ্য চাইল্ডহুড অব এ লীডার' প্রভৃতিতে সার্ত বুর্জোয়া অভিজাতদের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'মেন উইদাউট শ্যাডোজ' নাটকের বিষয়বস্তু নির্যাতন। 'দ্য রেসপেকটেবল প্রসটিটিউট' আমেরিকার জাতিগত বিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্যের প্রেক্ষাপটে রচিত। উল্লিখিত দুটো নাটকেই সার্ত দেখিয়েছেন যে, প্রতিরোধকারীরা কোনরকম অত্যাচার ও প্রলোভনের মাঝেও থেমে থাকেনি। 'ডার্টি হ্যাণ্ডস' নাটকে সার্ত কমিউনিস্ট সংগঠনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ, কমিউনিস্ট নীতিবোধ, সংগঠনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় বিচার করেছেন। অন্যদিকে শ্রেণী সংগ্রামের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন 'লুসিফার এণ্ড দ্য লর্ড' নাটকে। আবার সোভিয়েত বিরোধী তৎকালীন প্রচারণার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন 'নেক্রাসভ' নাটকে। 'হোয়াট ইজ লিটারেচার'-এ 'পরিস্থিতির নাটকের' কথা বলেছেন এবং ভাষার গঠন, ব্যবহার ও ভাষার সাথে লেখকের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'পলিটিক্স এণ্ড লিটারেচার'-এ তিনি আজকের যুগের লেখকের পক্ষে যে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়, সে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, লেখক বা যে-কেউ বাস্তব জগত তথা জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। কারণ আজ হোক কিংবা কাল হোক, তিনি এর দ্বারা প্রভাবিত হবেনই। 'ওয়ার্ডস' বা

'শব্দাবলী' মূলত তার শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি। এ বইতে সার্তের শৈশব, কৈশোর সহ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়।

লক্ষণীয়, দর্শনের তুলনায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে সার্তের অবদান কম উল্লেখ্য নয়। তিনি দার্শনিক তত্ত্বকেই অতি দক্ষতার সাথে বিবৃত করেছেন তার গল্প-উপন্যাস-নাটকে। তিনি যে অনেক প্রতিভা-দীপ্ত দার্শনিকের তুলনায় বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন, তার অন্যতম কারণও তার বিপুল ও নিপুণ সাহিত্যকর্ম। অন্যদিকে অস্তিত্ববাদের প্রচারের অন্যতম কারণও সার্ত। অতএব একথা বলা চলে যে, অস্তিত্ববাদের প্রচারের ক্ষেত্রে সার্তের সাহিত্যের অবদান সর্বাধিক।

অবশেষে কিছু কথা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে সে বাধ্য হয়ে। বাধ্য হয়েছে পারস্পরিক প্রয়োজনে। তবে সেদিনের সমাজ আর আজকের সমাজ এক নয়। তবুও একথা সত্য সমাজের বাইরে থেকে মানুষ, মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। সে হতে পারে 'অতিমানব' কিংবা 'বাঘের কোলে মানব শিশু' ধরনের কিছু। তাই মানুষকে তার সামাজিক অবস্থা-অবস্থানের ভিত্তিতেই বিচার করতে হবে, একক-ভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

এ কথা প্রমাণিত যে, প্রাচীন মানব সমাজ আর আজকের সমাজ এক নয়। প্রাচীন সমাজের পর মানুষের মাঝে আর একাত্মবোধ নেই। মানুষ যতই বুদ্ধির দিক থেকে এগুচ্ছে, ততই তার সাথে পারিপার্শ্বিকতার বিচ্ছিন্নতা, অন্যদের সাথে বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। সমাজে কিছু মানুষ বেশী সম্পদের অধিকারী হয়েছে, শক্তি ও বুদ্ধির ভিত্তিতে। স্বাভাবিকভাবে কিছু মানুষ সম্পদের যথার্থ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে বৈষম্য, শ্রেণী। সমাজে শ্রেণী থাকলে চিন্তার মাঝেও পার্থক্য থাকবে, একদল সম্পদ আঁকড়ে রাখবে, বৃদ্ধি করবে; অন্যদল সম্পদ দখল করতে চাইবে, অধিকার আদায় করতে চাইবে। আর এ দু'দলের চিন্তা-চেতনার মাঝে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সব মানুষের চিন্তাই কি স্পষ্টভাবে কোন-না-কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে? উত্তরে বলতে হয় হ্যাঁ, অবশ্যই। যেখানে শাসক ও শাসিত বিদ্যমান, শোষক ও শোষিত বিদ্যমান, নিপীড়ক ও নিপীড়িত বিদ্যমান, সেখানে প্রত্যেক মানুষের চিন্তা অবশ্যই এদের কারো-না-কারো পক্ষে যাবে। তবে যেটুকু পার্থক্য থাকতে পারে, তাহলো কারোটা স্পষ্টভাবে, আবার কারো চিন্তাধারা অস্পষ্টভাবে কোন--না-কোন পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও শেষ বিচারে তা-ও কোন-না-কোন পক্ষের হয়ে কাজ করে।

এখন প্রশ্ন হলো অস্তিত্ববাদ সামগ্রিক অর্থে কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে? অস্তিত্ববাদীরা মানব জীবনের সমস্যায় উৎকণ্ঠিত হয়েছেন; বিদ্যমান নৈতিকতা, বিশেষভাবে বুর্জোয়া নৈতিকতাকে অস্বীকার করেছেন, স্বাধীনতার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। এসব কিছুই আমরা স্বীকার করি। কিন্তু আমরা এ-ও স্বীকার করি যে, মানুষ কোন যন্ত্র নয়। অতএব মানব জীবনকে যন্ত্রের সাথে তুলনা করাও সম্ভব হয় না। তা-সত্ত্বেও, আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে যে, সামাজিক মানব জীবনকে আত্মিকতা দিয়ে, ব্যক্তি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা যথার্থ বাস্তবতা নয়। এ কথা ঠিক যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সার্মগ্রিক অর্থে ভাল বা মন্দ বলে কিছু থাকতে পারে না। সব কিছু এক শ্রেণীর জন্য ভালো, অন্য শ্রেণীর জন্য মন্দ। তাই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করলে অবশ্যই যেকোন শ্রেণী দৃষ্টিভংগিকে গ্রহণ করতে হবে। অস্তিত্ববাদীরা সামাজিক শেণী, শ্রেণী বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন নি। ফলে তারা স্বাধীনতা সম্পর্কিত যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গিও লাভ করতে পারেননি। এটা অস্তিত্ববাদীদের সীমাবদ্ধতা। যদিও এর কারণ অস্তিবাদী আত্মিকতা।

বুর্জোয়া শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান বাস্তব ও যৌক্তিকভাবে প্রমাণিত। এ বাস্তব অবস্থাকে একান্ত আত্মিকতা দিয়ে দেখা সম্ভব

নয়। অবশ্য অস্তিত্ববাদীরা সবাই তা দেখতে চানও নি। তাদের আত্মিকতা, বিদ্রোহ, স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতা আসলে এক ধরনের ভাবালুতা। তা শেষ বিচারে সমস্যা কবলিত মানুষকে সমস্যা দেখতে, বাস্তব সত্যকে স্বীকার করতে বাধা দেয়। সামাজিক শ্রেণী নিপীড়নকে আত্মিকভাবে বিচার করে বলে, বাস্তবভাবে অস্বীকার করে। পরিণতিতে নিপীড়ক শ্রেণীকে সাহায্য করে এবং নিপীড়িতদের প্রতারিত হয়েও সব কিছু আত্মিকতার ভিত্তিতে বিচার করতে বলে। এসব বাস্তবতার ভিত্তিতে বিচার করে বলা চলে, অস্তিত্ববাদ আসলে নিপীড়িত মানবতার চিন্তা-ভাবনা তথা মুক্তি ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধেই অবস্থান গ্রহণ করেছে।

সার্ত্র ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্ববাদীর চিন্তা-ভাবনা দর্শনের জগতে তেমন কোন অবস্থান গ্রহণ করতে পারে নি। ব্যতিক্রম হলো সার্ত্রীয় চিন্তা-ভাবনা। শুধু ফরাসী দেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী সার্ত্র পরিচিতি লাভ করেছেন নানা কারণে। তার সম্পর্কে মন্তব্যের মধ্য দিয়েই এ গ্রন্থের আলোচনা শেষ করবো।

সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদে দু'টো বিষয় মৌলিকভাবে বিদ্যমান। আর তা হলো আত্মিকতা ও স্বাধীনতার ধারণা। আত্মিকতা অস্তিত্ববাদী দর্শনের মাঝে এতই মৌলিক যে, এ প্রত্যয় বাদ দিলে অস্তিত্ববাদ আর অস্তিত্ববাদ থাকে না। তাই, সার্ত্রীয় চিন্তায় অস্তিত্ববাদের ধারণা প্রবলভাবে উপস্থিত। কিন্তু, সার্ত্র অন্যদের মতো স্বাধীনতাকে শুধু আত্মিকতা দিয়ে বিচার করতে চাইলেও পারেন নি, যুগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না-পারার কারণেই। তাই, তিনি একে ব্যক্তিক আত্মিকতা হতে মানবিক আত্মিকতায় উন্নীত করতে চেয়েছেন। এবং মানবতাবাদের কথাও বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সার্ত্র কি যথার্থ অর্থে

মানবতাবাদী, অর্থাৎ সমসাময়িক বাস্তবতার ভিত্তিতে মানবতাবাদী হতে পেরেছিলেন? উত্তরে বলা চলে, না।

সার্ত মানবতাবাদী হতে চেয়েছেন। আবার ব্যক্তিক আত্মিকতা ও অস্তিত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিক চিন্তাকে সমগ্র মানবের চিন্তা বলেও অভিহিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু যৌক্তিক বিচারে এখানে এক ধরনের কূটাভাষ বা আপাতবিরোধ তথা স্ব-বিরোধ প্রবলভাবে বিদ্যমান। সার্ত সারাজীবন এ স্ব-বিরোধের মাঝেই নিমজ্জিত ছিলেন। সার্তীয় দর্শনে স্বাধীনতার প্রত্যয়ও মৌলিক। কিন্তু তার স্বাধীনতার প্রত্যয় প্রধানত ব্যক্তিক স্বাধীনতা বলে, তার মাঝেও বিদ্যমান স্ব-বিরোধ।

সার্তীয় চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি দেকার্ত, কাণ্ট, হেগেল, মার্কস, হুসার্ল, হাইডেগার, নীটশে প্রমুখের প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। অন্যদিকে লক্ষ্য করেছিলেন যে, আজকের সামাজিক অশান্তির কারণে মানব অস্তিত্ব নিতান্তই নিরাপত্তাহীন। তাই তিনি তার গভীর অনুভূতি দিয়ে এ অবস্থার অবসান চেয়েছেন। কিন্তু অবসান চাইতে গিয়ে তিনি গ্রহণ করেছেন আত্মিক পদ্ধতি। যদিও আত্মিক পদ্ধতি বাস্তবতাকে চিনতে দেয় না। তাই সার্তের চিন্তায় পূর্ব থেকে অবস্থিত আত্মিকতার ভিত্তিতে তিনি যখন মানবিক সংকট উত্তরণের জন্য প্রয়াসী হয়েছেন তখন কর্মের মধ্য দিয়ে কখনো কখনো বাস্তবতার কাছাকাছি এসেছেন সত্য, কিন্তু দার্শনিক হিসেবে আবার সরে গেছেন দূরে, অনেক দূরে। ফলে, তিনি যে সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন, যে 'মানবতার বাণী' প্রচার করতে চেয়েছেন, তা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারেনি। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বার বার। এবং শেষ জীবনে হয়তো অনুতপ্তও ছিলেন এ কারণে। কিন্তু 'অনতিক্রান্ত বৃত্তের' মাঝ হতে তিনি কখনো বেরিয়ে আসতে

পারেন নি। ফলে যথার্থ অর্থে তাকে স্বাধীনতা ও মানবতার দার্শনিক বলে চিহ্নিত করা যায় না।

সার্তীয় দর্শনের মাঝে আমরা স্বাধীনতা, অপরিহার্যতা, বিচ্ছিন্নতা, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ক যে ধারণা পাই, তা মানব সভ্যতার বিদ্যমান সংকট অনুধাবনে আমাদের সহায়তা করে। তা সত্ত্বেও, আমরা তার বক্তব্যের ভিত্তিতে যথার্থ মুক্তি ও স্বাধীনতার সন্ধান পাই না। আমরা তার দর্শনের ভিত্তিতে বিদ্রোহী হতে পারি, কিন্তু বিদ্রোহকে পরিণত রূপ দিতে পারি না। আমরা তার বক্তব্যের ভিত্তিতে সোচ্চার হতে পারি, কিন্তু লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি না। আমরা সার্তীয় দর্শনের ভিত্তিতে আশাবাদী হতে পারি, কিন্তু আশাকে যথার্থ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করতে পারি না। কারণ, এ দর্শন আমাদের আবেগ আপ্লুত করে, কিন্তু যৌক্তিক ভিত্তিতে যথার্থ পরিণতি লাভ করতে শেখায় না, কিংবা সহায়তা করে না।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা চলে, অন্যান্য অস্তিত্ববাদীর চিন্তা-চেতনা আমাদের স্বাধীনতার পথে অবশ্য অন্তরায়। এমনকি সার্তীয় চিন্তা-চেতনা আমাদের স্বাধীনতার জন্য আশাবাদী করে তোলে ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের যৌক্তিক পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়। আমাদের সোচ্চার করে তোলে এবং মাঝ পথে ছেড়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে হলেও, আমাদের সংকট, হতাশা, উদ্বেগের মাঝে নিক্ষেপ করে। তাই যথার্থ বিচারে অস্তিত্ববাদ তথা সার্তীয় অস্তিত্ববাদ মানব মুক্তির ও স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ায় না।

আমাদের দায়িত্ব হলো, সামগ্রিক মানব সমাজের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য প্রত্যাশী ও প্রয়াসী হওয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবশ্য বিদ্যমান বৈষম্য, তথা শ্রেণীগত পার্থক্যকে স্বীকার করে, বাস্তবতার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। কোন রকম আত্মিকতার পথে

স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব বাস্তব সমস্যাকে দূরীকরণের ভিত্তিতে। তাই, আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারণবাদ, এবং জাতীয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান উৎপীড়ক ও শোষক শ্রেণী তথা একাধিপত্যবাদী শক্তিকে চিহ্নিত করে বাস্তবতা এবং যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ ও ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বে স্বাধীনতা লাভ করা, মানবতা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর। এক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদ যথার্থ অর্থে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। তাই, এ বাস্তবতার ভিত্তিতেই অস্তিত্ববাদকে বিচার করা এবং উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

আমিনুল ইসলাম : সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন

নীরু কুমার চাকমা : অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

সঞ্জীব ঘোষ : জাঁ-পল সার্ত : জীবন ও দর্শন

সরদার ফজলুল করিম : দর্শনকোষ

সাইয়েদ আবদুল হাই : দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ

শরীফ হারুন : জ্যাঁ-পল সার্ত এবং অস্তিত্ববাদ
: অস্তিবাদ এবং মানবতাবাদ (অনুবাদ)

Barret, W. H. : Irrational Man, A Study in Existential Philosophy

Blackham, H. J. : Six Existentialist Thinkers

Collins, J. : The Existentialists

Heidegger, M. : Existence and Being

Heinemann, F. H. : Existentialism and the Modern Predicament

Kaufmam, W. A : Existentialism From Dostoevsky to Sartre

Manser, A. : Sarte, A Philosophic Study

Molina, F. : Existentialism as Philpsoply

Olson, R. G. : An Introduction to Existentialism

Patka, F. : Existenialism, Thinkes and Thought

Passmore, J. : A Hundred Years of Philosoply

Roubiczek, P. : Existentialism For and Against

Sanborn, P. F. : Existentialism

এ গ্রন্থমালার বই সবার জন্যে।

আধুনিক সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে অস্তিত্ববাদ। কি এই দর্শন? কোন্ প্রেক্ষাপটে এ দর্শন গড়ে উঠেছে? কেন তা আধুনিক মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিলো? নিরাপত্তাহীন মানব অস্তিত্বকে কি আত্মিক সমৃদ্ধিই বাঁচাতে পারে? এ-প্রশ্ন তোলা হয়েছে এ-বইয়ে।